

ভগিনী নিবেদিতা

রবিদাস সাহারায়

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড্
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

ফাল্গুন
১৩৫৭

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

উপহার

....

..

...

...

ভগিনী নিবেদিতা—



ভগিনী নিবেদিতা

এক

"ঠাকুরমা, গল্প বলো।"

"কিসের গল্প বলবো? রাজরানীর না বাঘভালুকের?"

"না, বাঘভালুকের গল্প মোটেই ভালো না। বড্ড হিংস্কুটে ওরা! মানুষকেও খায়।"

মার্গারেটের ভীষণ রাগ হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের উপর।

ছোট্ট, চার পাঁচ বছরের মেয়ে। হিংসা অহিংসার বোঝেই বা কি!

তবু কী বুদ্ধি! কী অনুভূতি! একজন আর একজনকে ঘৃণা করবে—একজন আর একজনকে ভালোবাসবে না এটা কেমন কথা?

সামান্য বিচারবুদ্ধি দিয়েও মার্গারেট এর কোন যুক্তি খুঁজে পায় না।

আদুরে মেয়ে মার্গারেট। ঠাকুরমার অতি প্রিয় নাতনী।

মেয়েটির ঠাকুরদা হলেন জন নোবল। এককালে তিনি ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের একজন নামজাদা লোক।

এঁদের আদিবাস ছিল স্কটল্যাণ্ডে। চৌদ্দ শতকের শেষভাগে স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করে উত্তর-আয়ারল্যাণ্ডে এসে বসবাস করতে লাগলেন এই নোবল পরিবার।

জন নোবল পরিচিত ছিলেন রেভারেণ্ড নোবল নামে। তিনি ছিলেন ওয়েসলিয়ান চার্চের ধর্মযাজক।

ধর্মানুরাগী লোক হলেও তাঁর অন্তরে ছিল গভীর স্বদেশপ্রীতি।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চলছিল তখন আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি-সংগ্রাম। রেভারেণ্ড নোবলের মন তাই গির্জার অনুশাসনে বাঁধা রইল না। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই মুক্তি-আন্দোলনে।

ইতিমধ্যে নোবলের পরিচয় হল মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাস নামে এক তরুণীর সঙ্গে। পরিচয় থেকে হল পরিণয়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বিপ্লবী জনতার সঙ্গে রাজপথে এসে দাঁড়ালেন।

কিন্তু অকালেই দু'জনের এই মিলিত জীবনের পথে ছেদ পড়ল। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিধবা হলেন এলিজাবেথ নীলাস। সংসারে শুরু হল বিপর্যয়।

স্যামুয়েল রিচমণ্ড তাঁদের চতুর্থ সন্তান। অতি কষ্টে মানুষ হলেন কাকার কাছে।

বড় হলেন স্যামুয়েল। এবার বুঝি সুদিন এল।

মা যথাসময়ে ছেলের বিয়ে দিলেন মেরী ইজাবেল নামে প্রতিবেশিনী এক মেয়ের সাথে।

বিয়ের পর স্যামুয়েল রিচমণ্ড মেরী ইজাবেলকে নিয়ে উত্তর-আয়ারল্যাণ্ডের ড্যানগ্যানন শহরে চলে গেলেন। পিতার পথ অনুসরণ করে নিলেন ধর্মযাজকের বৃত্তি।

১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর মেরীর কোল জুড়ে জন্ম নিল এক ফুটফুটে শিশু।

আশ্চর্য লাবণ্যভরা দুটি নীল চোখ। সে চোখে যেন এক স্বর্গীয় দীপ্তি।

দেখে সবার চোখ জুড়িয়ে যায়।

ছুটে আসে মেরীর বান্ধবীর দল। ঠাট্টা করে বলে—"ভাখো ভাখো, মেয়ের চোখের কী চাউনি!"

"আর এইটুকুন মেয়ের রূপের ছটা দেখ!"

কেউ কেউ বলে—"ওগো মেরী, দেখে নিও তোমার মেয়ে সারা দুনিয়ার লোকের মন ভোলাবে!"

কিন্তু তখন কে জানতো তাদের সেই বিদ্রূপের বাণী একদিন সত্যি হয়ে উঠবে। এই ছোট্ট মেয়েটি সত্যই পৃথিবীর মাঝে হয়ে উঠবে একটি সেরা মেয়ে। যার নাম লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

মায়েরও মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ততার সীমা নেই। নামকরণ করতে হবে মেয়ের। কি নাম রাখা যায়?

শেষে ঠাকুরমার নামের সাথে মিলিয়ে মেয়ের নাম রাখা হল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল।

সুখে দুঃখে কেটে যেতে লাগল দিন।

কিন্তু স্যামুয়েল এক আলাদা ধাঁচের মানুষ। বৈচিত্র্য ও সংগ্রামহীন জীবনের জড়তা তার জন্য নয়।

ছোট্ট শহর ড্যানগ্যানন পড়ে রইল পিছনে। স্যামুয়েল চলে গেলেন ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে। মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ঠাকুরমার কাছে। মেরী গেলেন স্বামীর সঙ্গে।

মার্গারেট বড় হতে লাগল ঠাকুরমার আদরে।

পল্লীর সহজ সরল জীবন। প্রকৃতির নির্জন সৌন্দর্য ছোট শিশুর মন ভরিয়ে দেয় নানা রূপে ও রঙে।

ঠাকুরমার কোলে বসে গল্প শোনে মার্গারেট।

এমনি করে কেটে যায় একটি একটি করে চারটি বছর।

আবার ডাক আসে মার্গারেটের বাবা মায়ের কাছ থেকে: চলে যায় সে ম্যাঞ্চেস্টারে।

নূতন এক আবহাওয়ায় গিয়ে পড়ে মার্গারেট। অচেনা জায়গা —বাবা মাও যেন অচেনা। এর মধ্যে তার একটি ছোট বোনেরও জন্ম হয়েছে। সেই বোনটি একেবারেই অচেনা।

পল্লীর মুক্ত অঙ্গন ছেড়ে শহরের বদ্ধ আবহাওয়ায় মন হাঁপিয়ে ওঠে মার্গারেটের।

এদিকে বাবা স্যামুয়েলের মনও চঞ্চল। চার বছর এক জায়গায় কাটিয়ে মন হাঁপিয়ে ওঠে। ওল্ডহ্যাম গির্জার চাকরি ছেড়ে চলে যান এক নিভৃত পল্লীগ্রামে। সেখানেই বেছে নেন তাঁর কর্মস্থান।

ছোট্ট টরেণ্টন গ্রাম।

সেখানে গিয়ে মার্গারেট যেন নিজের সহজ জীবনকে খুঁজে পায়।

আঃ! কী আরাম! কী আনন্দ!

প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করে কাটে মার্গারেটের দিন।

দিনে দিনে বড় হতে থাকে মার্গারেট। সংসারকে বুঝতে শেখে—বাবা মায়ের ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে।

দশ বছরে পা দেয় চঞ্চলা বালিকা। ধীরে ধীরে চঞ্চলতা কমে আসে। বাবার প্রিয় সঙ্গী হয়ে ওঠে মার্গারেট। বাবা বাইরে গেলে মেয়েও সঙ্গে যায়। গির্জায় ভাষণ দেবার সময় মেয়েও থাকে সঙ্গে। ধর্মের কথা শোনে। বুঝতে চেষ্টা করে।

বাবার মুখেই মার্গারেট শুনতে পায় আইরিশ বিপ্লবের ইতিহাস। স্বদেশের পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করবার চেষ্টা করে মনে মনে।

বন্ধুবৎসল স্যামুয়েল। অনেক বন্ধুই আসে বাড়িতে। তারা মার্গারেটের গুণ দেখে মুগ্ধ হয়। বলে—তোমার মেয়ে খুব ভাগ্যবতী হবে।

ভারতবর্ষ ঘুরে একদিন এলেন এক ধর্মযাজক বন্ধু। মার্গারেটের বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে গেলেন। কথাবার্তা শুনে আরও অবাক্ হলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার মেয়ে দেখি এ বয়সেই ধর্ম-সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে?"

স্যামুয়েল বললেন—"হ্যাঁ। সেণ্ট জনের 'সুসমাচার' ওর মুখস্থ। তা ছাড়া গির্জায় আমার প্রত্যেক বক্তৃতা ও শোনে।"

বন্ধুটি বললেন—"আশ্চর্য মেয়ে !"

বিদায় নেবার সময় মার্গারেটের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—"তুমি বড় হবে—অনেক বড়। সুদূর ভারতবর্ষ একদিন ডাক দেবে তোমাকে।"

ভারতবর্ষ !

মার্গারেট অবাক্ হয়ে তাকায় পিতৃবন্ধুর দিকে। ভারতবর্ষ কোথায় ? সে কি কোন রূপকথার দেশ !

মানুষের দিন চিরকাল সমান যায় না। এ রকম থাকে না চিরকাল কারুর স্বাস্থ্য।

স্যামুয়েল অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

স্ত্রীকে বললেন—"আমি আর বাঁচবো না।"

"ছিঃ ছিঃ, একি অলক্ষণে কথা !" ডুকরে কেঁদে উঠলেন মেরী।

মার্গারেট আহার-নিদ্রা ভুলে বাবার সেবাযত্ন করতে লাগল।

ভগবদ্‌প্রেমিক সত্যাশ্রয়ী স্যামুয়েল······অন্তরে অন্তরে হয়তো শুনতে পেয়েছিলেন পরপারের আহ্বান। তাই মেরীকে বললেন—"দেখ, মার্গারেট বড় কিছু করবার জন্যই এ পৃথিবীতে এসেছে। ঈশ্বর নিজে তাঁর কাজের জন্য ওকে ডাকবেন। তুমি ওর এই নিয়তি নির্ধারিত পথে বাধা হয়ো না।"

কথা বলবার পরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন স্যামুয়েল।

আশ্চর্য মৃত্যু !

কেঁদে কেঁদে আকুল হল মার্গারেট। স্যামুয়েল শুধু তার পিতাই ছিলেন না—ছিলেন তার কৈশোর জীবনের বন্ধুও।

কেন পিতা তাকে ছেড়ে চলে গেলেন অকালে ? কোথায় গেলেন ? কেন গেলেন ? কেন ?

কিশোর মনে এ প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পায় না মার্গারেট।

শুধু কাঁদে ! শুধু কাঁদে !

দুই

স্যামুয়েলের মৃত্যু সংসারটাকে ভেঙে তছনছ করে দিল।

মেরী দিশেহারা। কি করে সংসার চলবে!

আর কোন উপায় না দেখে দুটি মেয়ে আর কোলের ছেলেটিকে নিয়ে মেরী চলে গেলেন তাঁর বাবার কাছে আয়ারল্যাণ্ডে।

আবার সেই ছেলেবেলার আয়ারল্যাণ্ড। মেরীর চিরপরিচিত জায়গা। মার্গারেটের কিন্তু এ জায়গাটা অচেনা। দাদু হ্যামিলটনও অচেনা তাঁর কাছে।

কিন্তু দাদুর স্নেহচ্ছায়ায় অল্পদিনেই অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন মার্গারেট।

হয়ে ওঠেন আদুরে।

কিন্তু শুধু আদর দিলেই তো চলবে না।

নাতনী বড় হয়েছে—পড়াশুনার ব্যবস্থা করাও দরকার।

মার্গারেট ছোট বোন মে-র হাত ধরে পা দিলেন বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে শুরু হল তাঁদের প্রথম শিক্ষাজীবন।

মুক্ত ডানা মেলে যে পাখিরা অবাধে ঘুরে বেড়াত তারা এবার বাঁধা পড়ল পিঞ্জরে। বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলার গণ্ডিতে বাঁধা পড়ল তাঁদের মন।

হাঁপিয়ে ওঠেন চঞ্চল কিশোর-কিশোরীরা।

একটা সপ্তাহ মনে হয় যেন একটা মাস।

ছুটির দিনে তবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। স্কুল সীমানার বাইরে নীল উঁচু পাহাড় তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। ছুটে যান

তাঁরা সেখানে। পাখা মেলে দিয়ে যেন উড়ে বেড়ান। মন হালকা হয়ে যায়।

তারপরেই আবার সেই বিদ্যালয়ের বন্দীজীবন।

প্রধান শিক্ষিকা ল্যারেট ভীষণ কড়া। স্কুলের নিয়মকানুন একচুল এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। কিন্তু পড়ান খুব ভালো। শুধু পড়াই নয়—তার সঙ্গে শেখান সংযম—শেখান নিয়মানুবর্তিতা।

মার্গারেট শ্রদ্ধা করেন শিক্ষিকা ল্যারেটকে।

ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন তাঁর কাছে এক আদর্শ নারী। তাঁর শিক্ষা তাঁর সংযম মার্গারেটকে যেন এক নতুন জগতে নিয়ে যায়।

ল্যারেট বদলী হলেন। এলেন নতুন শিক্ষিকা মিস্ কলিন্‌স।

মার্গারেটের চোখে কলিন্‌স এক আশ্চর্য মানুষ। তাঁকে ঠিক যেন চেনা যায় না, বোঝা যায় না।

কিন্তু বিদুষী কলিন্‌সের চোখে এড়ায় না কিছুই। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে একদিন ধরা পড়ে গেলেন মার্গারেট। এই কিশোরী মেয়েটির মানসিক বিকাশ দেখে মিস কলিন্‌স মুগ্ধ হলেন। উজাড় করে দিলেন তাঁর স্নেহ-ভালবাসা মার্গারেটের প্রতি।

মিস কলিন্‌স পড়াতেন বিজ্ঞান। বিজ্ঞান পড়তে পড়তে মার্গারেট ভাবতেন—পৃথিবীর সব কিছুরই রূপান্তর হয়—কিন্তু মৃত্যুর পর আত্মারও রূপান্তর ঘটে কি ?

মার্গারেটের মনে পড়তো তাঁর পরলোকগত পিতার কথা। মন আনমনা হয়ে উঠতো—ছল ছল করে উঠতো চোখ।

ওদিকে মার্গারেটের মা মেরীও চলে গেলেন দূরে। বেলফাস্টে তিনি একটি বোর্ডিং খুলে তার পরিচালনা করতে লাগলেন। ছোট বোন মে মায়ের কাছে চলে গেল।

মার্গারেট এখন একা—কোথায় থাকবেন ? লেখাপড়া শেখারই বা কি হবে ?

মিস্ কলিন্স তাঁকে কাছে টেনে নিলেন। নিজের কাছে রেখে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

কলিন্সের শিক্ষায় মার্গারেটের মন যেন ক্রমশঃ অপার্থিব জগতে চলে যেতে লাগল। হয়ে উঠলেন তিনি আরও ভাববিলাসী। বিজ্ঞান শিক্ষার ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বিরাটত্বকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলেন মার্গারেট। কী বিরাট বিশাল এই পৃথিবী! মানুষ কত ছোট! অথচ তার আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই!

মার্গারেটের ভাবুক মনে জেগে ওঠে নানা কৌতূহল। তা প্রকাশ পায় তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে—ছোটখাটো নানা রচনার ভিতর দিয়ে।

মিস কলিন্স একদিন দেখে ফেলেন সেই খাতা।

"একি! তুমি প্রবন্ধ লিখেছ!"

মার্গারেট লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়েন। লুকোতে চান খাতাটি।

কিন্তু কলিন্স ছাড়েন না। পড়তে শুরু করেন।

"বাঃ! বাঃ! চমৎকার লিখেছ তো!"

এই বয়সে রচনার মৌলিকত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে যান মিস কলিন্স। তিনি বলেন—

"তোমার এই লেখা স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপাব।"

মার্গারেট ভাবতে পারেন না তাঁর লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পাবে।

সত্যি, সেই সব লেখা ছাপা হয় স্কুল ম্যাগাজিনের পাতায়। সহপাঠিনীদের কাছে মার্গারেটের কদর বেড়ে যায়।

দিন এগিয়ে চলে।

এগিয়ে আসে স্কুল-জীবনের শেষ পরীক্ষা।

মার্গারেট সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদায় নেন স্কুল থেকে।

বিদায়ের সময় অশ্রু ছল ছল হয়ে ওঠে মার্গারেটের চোখ। মিস

কলিন্সও ভাবাবেগে অধীর হয়ে পড়েন। আশীর্বাদ করেন মার্গারেটকে—"তুমি বিজয়িনী হবে। তোমার যশ-সৌরভ ছড়িয়ে পড়বে দেশ বিদেশে।"

আবার বাইরের মুক্ত আঙিনায় পা দিলেন মার্গারেট।

মায়ের কাছ থেকে আগেই জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এখন তাঁকেও বেছে নিতে হবে জীবিকার পথ।

কিন্তু কোন্ পথ নেবেন মার্গারেট? ভাবতে থাকেন।

মনের মাঝে জেগে ওঠে ল্যারেট ও কলিন্সের স্মৃতি। কী সুন্দর মহিমময় জীবন!

শিক্ষার পথই আদর্শ পথ। শিক্ষাজীবনই মানুষের সুন্দর জীবন।

মার্গারেট ভেবে ভেবে স্থির করলেন, শিক্ষার পথই বেছে নেবেন।

কাজ জুটেও গেল।

শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে চলে গেলেন কেসউইকে। সেটা ১৮৮৪ সাল।

আঠারোটি বসন্ত তখন ছোঁয়া দিয়ে গেছে মার্গারেটের জীবনে। এই বয়সেই শিক্ষাধারার সঙ্গে নিজের জীবনধারাকে দিলেন মিশিয়ে।

পেলেন আনন্দ, পেলেন তৃপ্তি!

ছোট বোন যে থাকে মায়ের কাছে বেলফাস্টে। ছোট ভাইও সেখানে আছে। সে বাড়িতে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকেন মার্গারেট, কিন্তু ভাল লাগে না। জীবনকে মনে হয় সংকীর্ণ। তাই চলে আসেন কেসউইকে।

ফুল যেন পাপড়ি মেলে ফুটতে থাকে।

মার্গারেটের জীবন বিকশিত হতে থাকে অন্য পথে।

সংসারের প্রতি আসে বিরক্তি বৈরাগ্য।

১৮৮৭ সালে আবার আসে নূতন আহ্বান। কেসউইকের চাকরি ছেড়ে দেন মার্গারেট। চলে যান রাগবির অনাথ-আশ্রমে।

অনাথা মেয়েদের আশ্রম।

নূতন অভিজ্ঞতা—নূতন পরিবেশ।

দুঃখী অনাথের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন মার্গারেট।

মানুষের সেবাই খ্রীস্টান ধর্মের প্রধান আদর্শ। মার্গারেট ছোটবেলা থেকেই তা জেনে আসছেন। এবার সুযোগ পেলেন সেই সেবার। রাগবির অনাথ-আশ্রম হয়ে উঠল তাঁর প্রিয় স্থান।...... সমস্ত অনাথ মেয়েরা হয়ে উঠল তাঁর আপন জন।

কয়েক বছর রাগবিতে থেকে মার্গারেট সঞ্চয় করলেন অনেক অভিজ্ঞতা।

এবার পাড়ি দিলেন নূতন কর্মস্থলে—রেক্সহামে।

খনি অঞ্চলের একটি স্কুল। খেটে খাওয়া মানুষের ভিড় সেখানে।

নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশে নিজের জীবনকে খুঁজে বেড়ান মার্গারেট। সেবার মাঝে নিজেকে আরও বিলিয়ে দেবার জন্য যোগ দেন চার্চের কর্মী হিসাবে।

সেণ্ট মার্কস চার্চ।

কত মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচয় ঘটে মার্গারেটের। আর্ত মানুষের বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—'

মার্গারেটের লেখনীর মুখ দিয়ে এবার সেই বাণীই বেরিয়ে আসে। দুঃখী আর্তজনের প্রতি সমবেদনায় মুখর হয়ে ওঠে তাঁর রচনা।

এমন সময় ওয়েলসবাসী এক তরুণ এসে দাঁড়ায় তাঁর পাশে। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে—নিবিড় হয়ে ওঠে প্রেম।

সেই তরুণের মধ্যে সম্ভবতঃ এমন কিছু দেখতে পেলেন মার্গারেট যাতে তাঁর মনে হল জীবনের লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলবার সে হবে এক-জন উপযুক্ত সঙ্গী।

কিন্তু পার্থিব প্রেমের মোহে নিজের জীবনকে বেঁধে ফেলতে মার্গারেট পৃথিবীতে আসেন নি। তাই সেই স্বপ্ন গেল ভেঙে। অতর্কিত রোগের আক্রমণে সেই তরুণ চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেল মার্গারেটের কাছ থেকে।

ভেঙে গেল মার্গারেটের মন। নিঃসঙ্গ বেদনার ছায়ায় সারা অন্তর গেল ছেয়ে।

রেক্সহামের পথঘাট গাছপালা তাঁর কাছে যেন দুঃসহ হয়ে উঠল।

ছেড়ে দিলেন চাকরি। চলে গেলেন চেস্টারে।

নূতন শিক্ষকতার জীবনে মনোনিবেশ করে সব কিছু ভোলবার চেস্টা করলেন।

কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত—উদাস। কর্মজীবন শুরু করার পর থেকেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। একক জীবনের বিষণ্ণতা যেন এবার মনে বেশি করে বাজতে লাগল।

মনে পড়ল মায়ের কথা। বোন মে-র কথা। ভাইটিও তখন বড় হয়েছে।

বোন মে তখন লিভারপুলে শিক্ষিকার কাজ করছে। একমাত্র ভাই রিচমণ্ড পড়াশোনা করছে ওখানকার কলেজে। দুই বোনের উপার্জনে কোন রকমে সংসার চলে যাবে—এই বিবেচনা করে মার্গারেট মাকে চলে আসতে বললেন লিভারপুলে। মা চলে এলেন।

ভাঙা সংসার জোড়া লাগল এবার। মার্গারেট লিভারপুল থেকে আসা-যাওয়া করে চাকরি করতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে মার্গারেটের সামনে খুলে যায় এক নূতন জীবনের পথ।

সুইট্জারল্যাণ্ড ও জার্মানীর দুই মনীষী—পেস্তলোৎসি ও ফ্রোবেলের নাম তখন সর্বত্র পরিচিত। শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে জগৎকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দান করেছেন তাঁরা। তাঁদের অভিনব ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে মার্গারেট মুগ্ধ হলেন।

অপরূপ এই শিক্ষার পরিকল্পনা। শিশুদের শিক্ষাকার্য চলবে পীড়নের দ্বারা নয়, চলবে নীতির মাধ্যমে ও খেলাধুলার ভিতর দিয়ে।

মার্গারেট এই ব্যাপারে উৎসাহী হলেন। নিজের বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করবার চেষ্টা করলেন এই শিক্ষাপদ্ধতি।

ফ্রোবেলের শিক্ষারীতি নিয়ে তখন গবেষণা করছিলেন লজম্যান ও মিসেস ডি লীউ। মার্গারেট নিয়মিত তাঁদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

নতুন কর্মের পথ গেল খুলে।

মার্গারেটের বোন মে-ও এসে দাঁড়ালেন দিদির পাশে।

লজম্যানের চেষ্টায় দু' বোনই সানডে ক্লাবের সভ্যা হলেন। ক্লাবে বক্তৃতা দেওয়া ও রচনা পাঠের সুযোগ মিলল।

ক্লাবের অন্যান্য সভ্যারা শীগগিরই আবিষ্কার করলেন—মার্গারেট একজন লেখিকা। শুধু প্রবন্ধই নয়—গল্পও তিনি লিখতে পারেন।

ব্যস, আর যাবে কোথায়? সবাই ধরে বসলেন গল্প লিখতে হবে।

গল্প লিখতেই হল মার্গারেটকে। লেখিকা হিসাবে নাম দিলেন—এলিজাবেথ নালাস।

সেই গল্প সানডে ক্লাবেও পড়া হল।

মিলল ধন্যবাদ—হাততালি।

মিসেস ডি লীউ একদিন বললেন—"আমি লণ্ডনে একটি স্কুল খুলব, তুমি তাতে যোগ দেবে মার্গারেট?"

মার্গারেট বিন্দুমাত্রও দ্বিধা না করে বললেন—"হ্যাঁ, দেব।"

ডি লীউ মার্গারেটের মত একটি মেয়েকেই খুঁজছিলেন। কাজেই মার্গারেটের সাক্ষাৎ পেয়ে খুশী হলেন।

ডি লীউ খুললেন নূতন স্কুল লণ্ডনের উইম্বলডনে। সেখানেই চলে গেলেন মার্গারেট।

তাঁর মা মেরীও লিভারপুল ছেড়ে উইম্বলডনে চলে এলেন। সেখানেই তাঁদের স্থায়ী বসবাস গড়ে উঠল।

নূতন কাজ—নূতন আনন্দ।

নূতন শিক্ষার আলোকে—নূতন আশায় ঝলমল শিশুদের মন। তাদের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে। তাদের মনকে গড়ে তুলতে হবে।

এই হল মার্গারেটের জীবনের ব্রত।

নূতন উৎসাহ নিয়ে নূতন বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক কাজে লেগে গেলেন মার্গারেট।

প্রচলিত নিয়মকানুনের গণ্ডি তুলে দেওয়া হল স্কুল থেকে। শিশুরা শিক্ষা নেবে তাদের ইচ্ছা ও স্বভাব অনুযায়ী। পাঠ্যপুস্তকের ভারী বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে না তাদের উপর। শিক্ষিকার কাজ হবে অলক্ষ্যে থেকে তাদের উপকরণ সংগ্রহ করে দেওয়া। শিশুরা নিজেরাই বেছে নেবে কোন্‌টা তাদের স্বভাবের উপযোগী।

মার্গারেট এই শিক্ষাপ্রণালীতে বিশেষ অভিজ্ঞা হয়ে উঠলেন।

এই সময়ে লণ্ডনে প্রিন্স পিটার ক্রপটকিনের সঙ্গে পরিচয় হল মার্গারেটের। ক্রপটকিন রাশিয়ার বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী—স্বদেশ থেকে নির্বাসিত। তাঁর কাছ থেকে মার্গারেট রাশিয়ার স্বৈরাচারী জারের বিরুদ্ধে রুশ জনগণের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কাহিনী শুনলেন। তা শুনে মার্গারেটের ধারণা হল, আয়ারল্যাণ্ডকে স্বাধীন করতে হলে কেবলমাত্র নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে হবে না, সশস্ত্র বিপ্লব দরকার।

ক্রপটকিনের উৎসাহেই মার্গারেট 'ফ্রী আয়ারল্যাণ্ড' নামক বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন।

১৮৯২ সালে মার্গারেট উইম্বলডনেই নিজে একটি আলাদা স্কুল খুললেন। নাম দিলেন রাস্কিন স্কুল। অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলটি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বহু শিক্ষকের সহযোগিতা পেলেন মার্গারেট। তাঁর মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন এবেনজার কুক। কুক শিশু চিত্র-শিল্পী। শিশুদের ছবি আঁকবার বিষয়ে তিনি ফ্রোবেল পদ্ধতিতে গবেষণা করছিলেন। মার্গারেট আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করলেন।

শুধু স্কুলের কাজেই মন বাঁধা থাকে না। বৃহত্তর কাজের ক্ষেত্রেও মন ছুটে যায় মার্গারেটের।

সুযোগ মিলে যায়। এবেনজার কুকের মারফতে পরিচয় হয় লেডি রিপন ও লেডি ইজাবেল মার্জেসনের সঙ্গে। লেডি রিপন ছিলেন একটি পত্রিকার সম্পাদিকা। লেডি মার্জেসন ছিলেন এক অভিজাতবংশীয় মহিলা। তাঁদের একটি ছোটখাটো সাহিত্য আসর ছিল। সেখানে অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিক আসতেন।

মার্গারেট যোগ দেওয়ার পর থেকে আসরটি যেন আরও জাঁকিয়ে উঠল। পরিণত হল একটি বিরাট ক্লাবে—তখন তার নাম দেওয়া হল সিসেম ক্লাব।

ওখানে মাঝে মাঝে আসতেন বার্নাড শ, হাক্সলী প্রভৃতি নামজাদা সাহিত্যিকরা। তাঁরা বক্তৃতা দিতেন ও সাহিত্য আলোচনা করতেন। চায়ের সঙ্গে সভা জমজমাট হয়ে উঠত।

পরশপাথরের ছোঁয়ায় লোহাও সোনা হয়। আর সোনা! সে হয়ে ওঠে বুঝি হীরে!

মার্গারেটের ভিতর যে সাহিত্য-মনের কুঁড়িটি ছিল এবার তা ফুটতে শুরু করল। নানা কাগজে ছাপা হতে লাগল তাঁর লেখা।

লণ্ডনের শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হয়ে উঠল একটি নাম—মার্গারেট নোবল।

কিন্তু নিয়তির গতি দুর্বার।

আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রামের ভেরী আবার বেজে উঠল নূতন করে। দেশ এগিয়ে চলল সশস্ত্র বিপ্লবের পথে। লণ্ডনে গড়ে উঠল আইরিশ বিপ্লবের দু'টি কেন্দ্র।

আয়ারল্যাণ্ডের মেয়ে মার্গারেট চুপ করে থাকতে পারলেন না। শিরায় শিরায় তাঁর বইছে বিদ্রোহীর রক্তের ধারা—ঠাকুরদার—বাবার।

বিপ্লবীদের সঙ্গে মার্গারেট যোগাযোগ করতে লাগলেন।

দেশের ডাকে আকুল হয়ে উঠলেন মার্গারেট।

কিন্তু ওদিকে সারা পৃথিবীর দুর্গত মানুষের ডাক ধ্বনিত হয়ে উঠল আকাশে বাতাসে।

ভারতের এক সন্ন্যাসী নিয়ে এলেন সেই ডাক।

১৮৯৫ সাল।

লণ্ডনেও সেই ডাক এসে পৌঁছল।

মার্গারেট চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

তিন

এবেনজার কুক বললেন—"ভারতবর্ষের এক হিন্দু সন্ন্যাসী এসেছে লেডি মার্জেসনের বাড়িতে। তুমি যাবে মার্গারেট ?"

মার্গারেট চমকে উঠলেন—ভারতবর্ষ !

কুক বললেন—"সন্ন্যাসী সেখানে কিছু বলবেন। মার্জেসন তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পারো।"

এই সন্ন্যাসীর কথা মার্গারেট কয়েকদিন ধরেই শুনছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনা সভায় যাবার আমন্ত্রণ এর আগে কখনও পান নি। তাই বিস্মিত ও চমকিত হয়ে উঠলেন একটু। কিন্তু······

মার্গারেট ভাবতে লাগলেন—গিয়ে কিছু লাভ হবে কি ?

তেমন কোনো সাড়া জাগল না অন্তর থেকে।

কুক বললেন—"ভারতবর্ষের এই যোগী হয়তো জীবনে সত্যানুসন্ধানের পথে কিছু সাহায্য করতে পারেন।"

আবার ঝংকৃত হয়ে উঠল মার্গারেটের মন।

সত্যানুসন্ধান !

কৌতূহল জাগল মার্গারেটের মনে।

বললেন—"আচ্ছা যাবো !"

এসে গেল সেই নির্দিষ্ট আলোচনার দিন।

সেদিন মার্গারেট কোন কাজই করতে পারলেন না। ব্যাকুল-ভাবেই সভায় যাবার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

প্রথমে যেখানে যাওয়ার বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না এখন কেন সেখানে যাওয়ার জন্য মন এত চঞ্চল হয়ে উঠল তা মার্গারেট নিজেই বুঝতে পারলেন না।

ঘনিয়ে এল সন্ধ্যার গোধূলি লগ্ন।

লেডি মার্জেসনের বৈঠকখানা—ঘরের পর্দা সরিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালেন মার্গারেট।

ধূপের গন্ধে সুরভিত হয়ে উঠেছে সারা ঘরটি।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই কেমন একটা অস্বস্তি লাগল মার্গারেটের। জন পনেরো লোক সেখানে বসে আছেন। সবারই দৃষ্টি মার্গারেটের দিকে।

সবাই চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলছেন না। গেরুয়া আলখাল্লা পরা এক সন্ন্যাসী বসে আছেন ঘরের মাঝামাঝি বিশেষ এক আসনে! তাকিয়ে আছেন মার্গারেটের দিকে। মনে হয় যেন ধ্যানগম্ভীর মুখ।

মার্গারেট বিব্রত বোধ করলেন একটু।

স্বামিজীর মুখোমুখি একটি আসন রয়েছে খালি। মার্গারেটের জন্যই যেন সেটা রয়েছে। তাতেই বসলেন মার্গারেট—স্বামিজীর একেবারে মুখোমুখি।

মার্গারেট তাকিয়ে দেখলেন হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দিকে। সুদীর্ঘ জ্যোতির্মণ্ডিত শরীর—সারা দেহে যেন এক অনির্বচনীয় সুষমা। সুন্দর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে যেন এক স্বর্গীয় আনন্দময় দীপ্তি।

পিছনে ফায়ার-প্লেসে আগুন······

সেই আগুনের তেজ যেন বিকীরিত হচ্ছে মৃদু প্রবাহে।

লেডী মার্জেসন জানালেন—"যাঁরা আসবার তাঁরা এসে গেছেন, এখন আলোচনা শুরু হতে পারে।"

ঘরের দরজা বন্ধ হল।

স্বামিজী হাসলেন—উজ্জ্বল মধুর হাসি।

ঘরের আবহাওয়াও যেন মধুর হয়ে উঠল। উৎকর্ণ হয়ে সবাই তাকিয়ে রইলেন বিবেকানন্দের দিকে।

সন্ন্যাসীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল প্রার্থনার ধ্বনি—'শিব শিব নমঃ শিবায়।'

এবার শুরু হল আলোচনা।

মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে লাগলেন বিবেকানন্দ···কী মধুর সেই ধ্বনি······কী চমৎকার সেই উচ্চারণ······

বললেন—"খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের রয়েছে আশ্চর্য মিল। প্রেমের উপরেই উভয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা।

সকল ধর্মের একমাত্র শিক্ষা—ত্যাগ।

ত্যাগ কর অহমিকা—ত্যাগ কর হিংসা দ্বেষ—ত্যাগ কর স্বার্থ সুখ।"

স্বামিজী আবার বললেন—"হিন্দুরা বিশ্বাস করে শরীর ও মন এক তৃতীয় পদার্থ আত্মার দ্বারা পরিচালিত।"

এ কথায় মার্গারেটের মন আকৃষ্ট হল।

এ যে এক নূতন তত্ত্ব।

সবাই আগ্রহসহকারে শুনতে লাগলেন স্বামিজীর আলোচনা।

শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধা রমণী। অগ্রণী হয়ে তিনিই বিশেষ শিষ্টাচারের সঙ্গে নানা প্রশ্ন করছিলেন। জটিল প্রশ্নও তার মধ্যে অনেক।

অথচ কী সহজ ভাবেই না স্বামিজী জবাব দিতে লাগলেন।

এক নূতন অপরিচিত ভারতীয় যোগী এমন জটিল তত্ত্বের এত সহজ মীমাংসা করতে পারেন?

এ যে ভাবা যায় না।

অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন স্বামিজী। কোন জড়তা নেই মুখে।

মনে হয় যেন কোন এক দূর দেশের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছেন এই নবীন সন্ন্যাসী।

উদাত্ত কণ্ঠে স্বামিজী বললেন—"মানুষ ভ্রম থেকে ভ্রমে অগ্রসর হয় না, সত্য থেকে সত্যেই অগ্রসর হয়ে থাকে।"

বক্তৃতা শেষ হল।

সন্ন্যাসীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর তখনও যেন ঘরেব মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

সেদিন সেই হিন্দুযোগীকে দেখবার জন্য যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই ধর্মে খুব আস্থা ছিল না। কয়েকজন এসেছিলেন গৃহকর্ত্রীর বন্ধু হিসেবে আর কয়েকজন এসেছিলেন নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই। কারণ এই হিন্দুযোগীর অনেক কথাই তখন লণ্ডনের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

কাজেই বক্তৃতা শোনার আগ্রহ থাকলেও অনেকেরই মনে ছিল অহমিকা।

তাই বিদায় নেবার সময় তাঁরা লেডি মার্জেসনের কাছে বলে গেলেন—"সন্ন্যাসী আর এমন কি বললেন? এ তো সবই পুরনো কথা।"

কিন্তু কারুর মন্তব্যের প্রতি কর্ণপাত করলেন না মার্গারেট।

মার্গারেট উঠে দাঁড়ালেন। তাকালেন স্বামিজীর দিকে।

সন্ন্যাসীর চোখে যেন বিদ্যুতের দীপ্তি। সে দীপ্তিতে মার্গারেট চমকিত।

চোখ নামিয়ে ধীর পদে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কানে তাঁর বাজতে লাগল স্বামিজীর কণ্ঠনিঃসৃত গীতার শ্লোক—'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব'—

সূত্রে গাঁথা বহু মণির মতো আমার মধ্যে সব রয়েছে······

মার্গারেট ঘরে ফিরে এসে ভাবনার সমুদ্রে ডুবে গেলেন।

কোন কাজেই মন বসল না।

এই যোগাযোগের পিছনে কি রহস্য আছে কে জানে?

স্বামিজীর সঙ্গে পরিচয়ের আগে মার্গারেট জীবনে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাতে তাঁর চিত্তকে পূর্ণ করতে পারে নি। অতৃপ্তি ও দ্বন্দ্ব তাঁর অন্তররাজ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বাল্যকালে ধর্মের প্রতি তাঁর যে সহজ বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল, যৌবনের প্রখর বিচারবুদ্ধি ও সংশয়ের কাছে তার পরাজয় ঘটল।

ক্রমে মার্গারেট গির্জায় যাওয়া ছেড়ে দিলেন। প্রাণহীন, শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সত্যের সন্ধান করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র—এই ধারণাই তাঁর মনে বদ্ধমূল হল।

তবু মানসিক যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য সময় সময় হৃদয়কে অবসন্ন করে তুলতো।

তখন অভ্যাসবশতঃ আবার ছুটে যেতেন গির্জায়। ভাবতেন, অনুষ্ঠানে মগ্ন হয়ে হৃদয়ের ভার লাঘব করবেন।

আবার মনে হত সমস্তই যেন বৃথা আড়ম্বর।

দীর্ঘ সাতটি বছর কেটে গেল।

সন্দেহ-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল মার্গারেটের হৃদয়।

অনেক বই পড়লেন, বহু জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করলেন। দার্শনিক মতবাদগুলির উপর চিন্তা ও গবেষণা করলেন অনেক। কিন্তু সমস্তই বৃথা।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, বিজ্ঞানের অনুশীলনই হয়তো প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে। সত্য ও বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান। সেখানে কল্পনা ও ভাবুকতার স্থান নেই।

তখন চলল বিজ্ঞানের সাধনা।

সৃষ্টির উৎপত্তি এবং পৃথিবীর সব জিনিসের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে মার্গারেট আবিষ্কার করলেন প্রকৃতি যেন এক নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে বাঁধা। এর সব কিছুর মধ্যে রয়েছে একটি সংগতি।

কিন্তু ধর্মে এই সংগতি কোথায় ?

অথচ এমন একটি আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তুকে তো ত্যাগ করতে তিনি চান না। তিনি চান ধর্ম তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

মার্গারেটের মনে হল তিনি যেন অকূল সমুদ্রে দিশেহারা হয়ে চলেছেন এক কূল থেকে আর এক কূলের দিকে।

এই অকূল সাগর থেকে কে তাঁকে রক্ষা করবে ?

কে ?

এমন সময় তাঁর হাতে এসে পড়ল একখানি বই—'Light of Asia', বুদ্ধের জীবনী।

আগ্রহের সঙ্গে তিনি বইটি পড়তে লাগলেন।

বুদ্ধের অলৌকিক জীবন অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করল তাঁর মনে।

বই পড়া শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মন সংশয়মুক্ত হল না।

তবু একথা অন্তরে উপলব্ধি করতে পারলেন, মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের বাণীর চেয়ে বুদ্ধের বাণী অনেক সুন্দর।

আচারপঙ্কিল ধর্ম-সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা মনকে পীড়িত করে তুলল। অধ্যাত্মবাদের ভিত্তি মনে হতে লাগল সুদৃঢ়।

চার্চের প্রচলিত ধর্মাচরণে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আগেকার সেই সহজ সরল আবেগপূর্ণ ধর্মীয় মনোভাব মার্গারেটের মনে আর নেই, তার পরিবর্তে জেগে উঠেছে সত্যকে জানবার এক কঠোর সংকল্প।

ধর্ম কি সত্য হতে পৃথক্ ?

মার্গারেটের মন বলে—'না, ধর্ম ও সত্য এক।'

তবে কোথায় সেই ধর্ম ? যে ধর্মে সকলের স্থান আছে, যে ধর্ম উদারভাবে সকলকে কোলে টেনে নিতে পারে ?

মনের মাঝে এক প্রবল সংগ্রাম চলতে লাগল মার্গারেটের।

এই পরম সন্ধিক্ষণে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

সেটা ১৮৯৫ সাল।

লণ্ডনের অনেক মহল থেকেই কানাঘুষা শোনা যেতে লাগল এই ভারতীয় যোগীর নামে। মার্গারেটের কানেও সে খবর পৌঁছল।

কিন্তু প্রথম দিকে তাঁর কোন আগ্রহই দেখা গেল না।

তারপর লেডি মার্জেসনের ঘরে সেই অবাক্ মুগ্ধতায় প্রথম দর্শন।

বাড়ি ফিরে রাত্রির নিস্তব্ধ অবসরে স্বামিজীর কথাগুলো বার বার ভাবতে লাগলেন মার্গারেট।

কে বলে সন্ন্যাসীর কথার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই! এমন অনেক কথা তো শুনলাম যা কোন ধর্মযাজকের মুখ থেকে এর আগে কখনো শুনি নি। তাই তো কথাগুলো আমার মনের মধ্যে এমন আলোড়ন তুললো।

এমন চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শনলাভ তো আমার জীবনে এর আগে কখনো ঘটে নি।

স্বামিজী!

লণ্ডন শহরে লোকের মুখে মুখে এই নাম।

খবরের কাগজে কাগজেও এই একটি নামই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল—স্বামিজী।

ঘরোয়া আসর ছেড়ে সাধারণ সভায় এসে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ।

আধুনিক সভ্যতার পীঠভূমি লণ্ডন নগরী। তার দ্বারে আগত এক যোগী সন্ন্যাসী। মনে হয় বিরাট এক ছন্দপতন, দুয়ের মাঝে যেন কত ব্যবধান।

কিন্তু সব ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই—ধর্মে হিংসার কালিমা নেই—সে কথা সগর্বে প্রচার করবার জন্যই বুঝি এলেন এক নবীন যুগাবতার!

চার

সত্যি যুগাবতার বিবেকানন্দ !

ভারতের মহাজাগরণের নায়ক।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্পাদনের পুরোহিত।

তাই স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য ভূমিতে আগমন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মহাভাবতরঙ্গে সমগ্র বিশ্বকে স্পন্দিত করবার জন্য মহাযোগীর এ মহাপরিক্রমণ।

অন্তরে অত্যুগ্র কামনা নিয়ে সমগ্র ভারত ঘুরে বেড়ালেন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ। কন্যাকুমারিকার শেষ প্রস্তরখণ্ডে বসে তাকালেন বিশাল ভারতের দিকে।

অধ্যাত্ম-সম্পদে মহিমময় অতীত ভারত আজ ম্লান।

সম্মুখে অন্ধকারময় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

দুঃখ-দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও বন্ধনের জ্বালায় জর্জরিত নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ নরনারীর আকুল ক্রন্দনে ধ্বনিত আকাশ বাতাস।

মুক্তি চাই—মুক্তির সন্ধান চাই এই অগণিত নিপীড়িত মানবের জন্য।

কিসে মুক্তি ? কোথায় মুক্তি !

দারিদ্র্যের মুক্তির জন্য চাই অর্থ আর মানসিক এই অসহায় অবস্থার মুক্তির জন্য চাই প্রকৃত ধর্মের প্রতিষ্ঠা।

অন্তরে উপলব্ধি করলেন বিবেকানন্দ—এই ঘোর অবনতির জন্য দায়ী ধর্ম নয়। দায়ী ধর্মের নামে প্রচলিত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও কুসংস্কার।

প্রকৃত ধর্মসংস্থাপনের উপরেই নির্ভর করছে ভারতের জাতীয়

জীবনের পুনর্জাগরণ। ধর্মকে কেন্দ্র করেই ভারতকে আবার তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মনে মনে সংকল্প করলেন বিবেকানন্দ—পাশ্চাত্যে ঘোষণা করতে হবে ভারতের শাশ্বত সনাতন-ধর্ম আর তার বিনিময়ে ভারত লাভ করবে ব্যবহারিক জীবনের ঐশ্বর্য। আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ঘটবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার সমন্বয়।

অর্থ সংগ্রহের সম্ভাবনাও রয়েছে একমাত্র পাশ্চাত্যে। ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ অধ্যাত্মবাদ যদি পাশ্চাত্য জগতে স্বীকৃতি লাভ না করে তবে সেখান থেকে অর্থ সংগ্রহের আশাও নিরর্থক।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন বিবেকানন্দ।

স্বদেশভূমি ত্যাগ করলেন। ১৮৯৩ সালে এলেন আমেরিকায়।

শিকাগোতে তখন বিশ্বধর্মসম্মেলন বসেছে।

পৃথিবীর সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছেন সেখানে।

কিন্তু কী আশ্চর্য!

হিন্দুধর্মের কোন প্রতিনিধি সেই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন নি।

পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম এত অনাদৃত! এত অপরিচিত! কেন!

দুঃখে ও ক্ষোভে ভরে উঠল বিবেকানন্দের অন্তর। তিনি স্থির করলেন সেই সম্মেলনে যোগ দেবেন।

কিন্তু কোন পরিচয়পত্র তাঁর সঙ্গে নেই। সম্মেলনে তিনি প্রবেশ করবেন কেমন করে?

অনেক কষ্টে ও চেষ্টায় সুযোগ মিলল।

শুধু প্রবেশ করবার সুযোগই নয়, সভায় কিছু বলবার সুযোগও তিনি লাভ করলেন।

সেই বক্তৃতায় তিনি জয় করলেন সম্মেলনের সকল শ্রোতার মন। শুধু শ্রোতাদের মনই নয়—সারা আমেরিকাবাসীর মনও।

বিস্ময়ে চমকিত হয়ে উঠল আমেরিকার মানুষ!

কে এই সন্ন্যাসী! কোন্ দেশের সে মানুষ? কি তার ধর্ম?

আমেরিকা চিনল বিবেকানন্দকে। চিনল ভারতবর্ষকে। বিশেষ-ভাবে জানল হিন্দুধর্মকে।

এমনি করে জগতের সামনে এক নূতন পরিচয়ের দ্বার খুলে গেল।

স্বামিজী বললেন—"হে দিব্যলোকবাসী অমৃতের পুত্রগণ, সকলে শ্রবণ কর, আমি সেই অনাদি শাশ্বত পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, তিনি সকল অজ্ঞানের পারে; তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, পরিত্রাণ লাভের অন্য পথ নাই।

"তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ, তোমরা এই মর্ত্যভূমির দেবতা। তোমরা পাপী? অসম্ভব। মানবকে পাপী বলাই মহাপাপ। মানবমাত্রেই পবিত্র, মুক্ত, নিত্যানন্দময় আত্মা,—যে আত্মা সর্বব্যাপী, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, একমেবাদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ।"

স্বামিজী নূতন করে হিন্দুধর্মের সেই চিরন্তন বাণী প্রচার করলেন। —'প্রত্যেক ধর্মই সত্য, প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর বর্তমান। বিভিন্ন ধর্ম একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ।'

এই উদার তত্ত্ব আমেরিকাবাসীদের কাছে নূতন, অথচ বেদান্তের এই সার্বভৌমিক ভাবটি তাদের হৃদয় স্পর্শ করল।

স্বামিজী বললেন—"হিন্দুর নিকট সমগ্র ধর্মজগৎ এক। নানা রুচিবিশিষ্ট নরনারীর বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে একমাত্র ঈশ্বরোপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়াই তার লক্ষ্য। এই ধর্মজগতের সর্বপ্রকার ভেদ দূর করবে। সকল নরনারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করবে।"

এমনি করে হিন্দুধর্মের প্রচার ও বেদান্তের প্রচার বেড়েই চলল।

আমেরিকায় স্বামিজী বহু গুণমুগ্ধ ভক্ত ও বন্ধু লাভ করলেন।

লণ্ডন থেকে আহ্বান এল মিস হেনরিয়েটা মূলার ও মিঃ ই. টি. ষ্টার্ডির কাছ থেকে।

১৮৯৫ সালের মাঝামাঝি তাঁর অন্যতম বন্ধু মিঃ লগেটের সঙ্গে স্বামিজী নিউইয়র্ক থেকে রওনা হয়ে প্যারিস পৌঁছলেন।

ইওরোপীয় সভ্যতার পীঠস্থান প্যারিস স্বামিজীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল।

সেখানে কিছুদিন থাকার পর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এলেন লণ্ডনে। লণ্ডনে পৌঁছুতেই মিস মূলার ও মিঃ স্টার্ডি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। মিঃ স্টার্ডির বাড়িতেই তাঁর লণ্ডন প্রবাসের বাসস্থান নির্দিষ্ট হল।

স্বামিজীর মন তবু সংশয়ভারাক্রান্ত।

ইংরেজ শাসিত দেশের প্রজা তিনি। সেই ইংরেজদের দেশেই তিনি এসেছেন বিজিত দেশের ধর্মের মহিমা প্রচার করতে। কিভাবে ইংরেজ জাতি তাঁকে গ্রহণ করবে কে জানে?

তবু কাজে নেমে পড়লেন বিবেকানন্দ।

বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ও অভিজাতসম্প্রদায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাঁর আলোচনা-সভাগুলিতে লেডি ইজাবেল, মার্জেসন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাও যোগ দিতে লাগলেন।

প্রিয়দর্শন এই হিন্দুযোগীকে দেখবার ও তাঁর বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ লণ্ডনবাসীদের ক্রমেই বাড়তে লাগল।

২২শে অক্টোবর পিকাডিলির প্রিন্সেস হলে স্বামিজীর প্রকাশ্য বক্তৃতার আয়োজন হল। তাঁর বাগ্মিতায় ও পাণ্ডিত্যে শত শত নরনারী সেদিন মুগ্ধ হলেন।

পরদিন লণ্ডনের বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হল স্বামিজীর সমালোচনা···

অদ্ভুত···সুন্দর···চমৎকার···

তাই প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলেন মার্গারেট।

যেন তাঁর মনে কেউ পরশমণি ছুঁইয়ে দিল।

দুর্নিবার আকর্ষণে আবার ছুটে গেলেন স্বামিজীর বক্তৃতা-সভায়।

একবার নয়—দুবার।

মন তবু চঞ্চল—দ্বিধাগ্রস্ত।

স্বামিজী বক্তৃতা শেষে একদিন তাকালেন মার্গারেটের দিকে। মার্গারেট বুঝতে পারলেন সন্ন্যাসী তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনতে চান।

তাই বললেন—"আপনার সব কথা যে বুঝতে পারি কিংবা সত্য বলে মেনে নিতে পারি, আমার প্রকৃতি সে রকম নয়।"

স্বামিজী দ্বিধাবিহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন—"বিচার না করে আমি কাউকেই কিছু গ্রহণ করতে বলি না।"

চলে গেলেন সন্ন্যাসী।

লণ্ডন বাসের সময় তাঁর শেষ হয়ে এসেছিল। তাই আবার চলে গেলেন আমেরিকায়। ২৭শে নভেম্বর।

এই বিদায় ঘটনাটিও মার্গারেটের কাছে যেন সংকেতময়।

তাঁর কানে বাজতে লাগল স্বামিজীর কথা—"বিচার না করে আমি কাউকেই কিছু গ্রহণ করতে বলি না।"

বিচার করবার ইঙ্গিতই যেন দিয়ে গেলেন সন্ন্যাসী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা এই আইরিশ তরুণীকে। দিয়ে গেলেন অখণ্ড অবসর।

ভাবতে বসলেন মার্গারেট।

তাঁর ডায়েরি খুলে বসলেন। সেই ডায়েরিতে লেখা রয়েছে ভারতীয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নানা স্মৃতিকাহিনী। আর লেখা রয়েছে সেই সন্ন্যাসীর দেওয়া বক্তৃতার সারমর্ম।

...স্বামিজী যেন আমাদের কাছে কোন এক দূর দেশের বার্তা বহন করে এনেছেন।

…'খ্রীষ্টধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্মেও প্রেমই সব চেয়ে বড়ো…সব চেয়ে মহান্।'

…'জগৎ মাকড়সার জালের মত, আর মনগুলি সব মাকড়সা; কারণ মন এক, আবার বহু'—

মার্গারেটের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি ডায়েরি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

…জগৎ মাকড়সার জালের মত, আর মনগুলি সব মাকড়সা…

সেই মাকড়সার জালেই তো মানুষের মন বাঁধা পড়ে।

হায়রে মানুষের অবোধ মন!

মার্গারেটের মনে পড়ল, একজন শ্রোতা একদিন প্রশ্ন করেছিলেন স্বামিজীকে—"ধর্মরাজ্যের সব কথা আপনি জানেন?"

স্বামিজী জবাব দিয়েছিলেন—"হ্যাঁ,আমি পথের কোথায় কি আছে তা তন্ন তন্ন করে জানি, একটুকুও আমার অজ্ঞাত নেই।"

এ কি শুধু কথার কথা? এমন জোর করে বলতে পারে পৃথিবীর ক'জন মানুষ! কার আছে এমন আত্মপ্রত্যয়?

মার্গারেট ভাবতে লাগলেন।

অল্প কথায় বড় বড় ভাব ও জটিল্ দার্শনিক তত্ত্বগুলি জলের মত বুঝিয়ে দিতে আমি তো আর কাউকে দেখি নি।

কী আশ্চর্য মানুষ!

এমন সুন্দর স্বর্গীয় অবয়ব, চোখে মুখে এমন উজ্জ্বল দীপ্তি—এমন সুন্দর সরল ব্যবহার কোন মানুষের ভেতর তো আমি দেখি নি।

আমার জীবনের সম্বল কি খুঁজে পাব এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে?

মার্গারেট আবার ভাবতে লাগলেন।

ভাবনার অকূল সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন।

কিন্তু অন্তর থেকে যেন নীরব আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠল—স্বামিজী, তুমি আবার কবে আসবে!

পাঁচ

মার্গারেটের জীবনের গতি গেল ঘুরে।

চিন্তাধারার হল পরিবর্তন।

ভারতীয় দর্শন, উপনিষদ ও গীতায় মার্গারেটের টেবিল ভরে উঠল।

আগে এসব বিষয়ে তিনি অতি সামান্যই জানতেন। এখন থেকে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে ঐ সব বই পড়তে লাগলেন।

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মনে ভেসে ওঠে ভারতীয় যোগীর বাণী —"নিজেকে অসহায় মনে করো না। মানুষের বুকে ভগবান কেমন করে থাকেন জান তো? বড় ঘরের পর্দানশীন হিন্দুনারীর মতো। আড়াল থেকে তিনি সব দেখেন, কিন্তু বাইরের কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। তেমনি ভাবে তিনি আছেন তোমার মধ্যেও।"

মার্গারেট ভাবেন আর পড়েন। পড়েন আর ভাবেন।

দুর্নিবার তাঁর অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা। কোথায় সে অনুসন্ধানের শেষ কে জানে?

১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাস।

স্বামিজী আবার এলেন লণ্ডন।

এবার এসেও স্টার্ডির বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁর নির্দেশ অনুসারে আগেই লণ্ডনে এসে সেই বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

স্বামিজী বিলেতে আসতেই চারদিকে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। চারদিক থেকে ধ্বনি উঠতে লাগল—স্বামিজী! স্বামিজী!

মার্গারেট এসে দাঁড়ালেন স্বামিজীর পদপ্রান্তে।

সলজ্জ—নম্র—বিনয়ী।

তবু মনে তাঁর বিপুল আকুলতা—অসংখ্য জিজ্ঞাসা।

বিবেকানন্দের কাজ শুরু হল।

বাড়িতে বাড়িতে আলোচনা, বাইরে বক্তৃতা।

ক্লাস খোলা হল। প্রথম থেকে ক্লাসে শুরু হল ধারাবাহিক ভাবে 'জ্ঞানযোগ' আলোচনা। তারপর প্রতি রবিবার পিকাডিলির গ্যালারিতে নানা বিষয়ে বক্তৃতা।

কিছুদিন পর প্রতি রবিবার প্রিন্সেস হলে বক্তৃতার আয়োজন হল। বিষয়—ভক্তিযোগ, ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতি।

জুটল অনেক ছাত্র—অনেক শ্রোতা। মার্গারেটও ভরতি হলেন স্বামিজীর ক্লাসে।

একদিন মুখোমুখি দাঁড়ালেন বিবেকানন্দের কাছে। জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি কি সত্যই ঈশ্বরকে দেখেছেন?"

বিবেকানন্দ জবাব দিলেন—"হ্যাঁ, দেখেছি, এই যেমন তোমাকে দেখছি। দেখতে চাও তো দেখাতে পারি।"

এমন জবাব পাবেন মার্গারেট ভাবতে পারেন নি। কী অবিচল আত্মবিশ্বাস এই সন্ন্যাসীর!

অভিভূত হয়ে পড়লেন মার্গারেট।

সপ্তাহে চারদিন তিনি স্বামিজীর কাছে বেদান্তদর্শনের আলোচনা করতে লাগলেন। স্বামিজীর দেওয়া উপদেশই তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী হয়ে দাঁড়াল।

শুধু ক্লাসই নয়। যখন যেখানে স্বামিজীর বক্তৃতা হয় সেখানেই মার্গারেট ছুটে যান।

একদিন একটি সভার বক্তৃতা শেষ হলে এক জন বৃদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কাছে এসে বিবেকানন্দকে বললেন—"আপনি বড় সুন্দর বলেছেন, কিন্তু নূতন তো কিছু বলেন নি।"

এমন অদ্ভুত কথা শুনে শ্রোতারা বিস্মিত হল। মার্গারেট ছিলেন সেখানে। তিনি শুধু ভাবতে লাগলেন—এর কি জবাব দেবেন স্বামিজী!

কিন্তু স্বামিজী অতি সহজ ভাবে মধুর কণ্ঠে জবাব দিলেন—"আমি যা বলেছি তা আর কিছুই নয়, সত্য। ইহা হিমাদ্রির মতো প্রাচীন, মনুষ্যজাতির মতো প্রাচীন, সৃষ্টির মতো প্রাচীন এবং পরমেশ্বরের মতো প্রাচীন। যদি আমার এই কথা আপনার মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক করে দিতে সমর্থ হয়ে থাকে এবং আপনি সেই মতো জীবন যাপন করতে পারেন, তাহলে কি আমি সেটা ভাল করি নি?"

দার্শনিক পণ্ডিত আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন না। শ্রদ্ধায় তাঁর মস্তক অবনত হল।

চারদিক থেকে উঠল প্রশংসাধ্বনি ও করতালি।

মার্গারেটের মনে হল—তাঁর হৃদয় যেন কখন অলক্ষ্যে ঐ সর্বহারা সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে।

তবু মার্গারেট সময় সময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

দিন যায়—তবু সন্ন্যাসীর অন্তরের প্রকৃত রূপ যেন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না।

একদিন লণ্ডনের এক অভিজাত গৃহে বৈঠক বসল। মার্গারেটও গেলেন সেখানে।

বক্তৃতার শেষে স্বামিজী শুরু করলেন নানা দেশের আলোচনা। নানা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসও আলোচনা করলেন।

আগ্রহ সহকারে শুনতে লাগলেন মার্গারেট।

কথায় কথায় বললেন ভারতের উন্নতি-অবনতির ইতিহাস।

মার্গারেট বললেন—"কিন্তু লণ্ডনের মত শহর পৃথিবীর মধ্যে আর দ্বিতীয় নেই। যেমন সুন্দর তেমনি সভ্যতা ও শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ।"

বিবেকানন্দ বললেন—"হ্যাঁ, তা স্বীকার করি। কিন্তু ভুলে যাও কেন যে তোমাদের এই শহরকে সুন্দর করবার জন্য পৃথিবীর কত দেশ কত নগরের সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের মূলে আছে ভারতের অপরিমিত সম্পদ্ যা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সময় দশ হাতে লুঠ করা হয়েছে। ভারতের জন্যই তো আজ ইংলণ্ডের এই সমৃদ্ধি, লণ্ডনের এত সৌন্দর্য।"

মার্গারেটের অন্তরে যেন কশাঘাত হল। এই কথার অন্তরালে যে ইতিহাসের মর্মান্তিক সত্য রয়েছে তা তিনি অস্বীকার করবেন কেমন করে? শ্রোতারা সকলেই স্বামিজীর মুখের দিকে নির্বাক্‌ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

স্বামিজী বললেন—"তোমরা মনে রেখো, একটিকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য আর পাঁচটিকে ধ্বংস করা সৃষ্টি নয়, কৃতিত্ব নয়, নির্মম পরিহাস।"

মার্গারেট বুঝতে পারলেন এই সন্ন্যাসী শুধু স্বদেশপ্রেমে প্রণোদিত হয়েই এই কথা বলেন নি। সমগ্র জাতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে—সমগ্র অসুন্দরের বিরুদ্ধে তাঁর এই সত্যভাষণ।

এ যে সন্ন্যাসীর অন্তরের এক অভিনব পরিচয়!

শ্রদ্ধায় আবার বিগলিত হল মার্গারেটের অন্তর।

একদিন শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত তাঁর অ্যাভিন্যু রোডের বাড়িতে বিবেকানন্দকে নিমন্ত্রণ করলেন বক্তৃতা দেবার জন্য। লণ্ডনের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও দার্শনিকগণ বক্তৃতা শোনবার জন্য নিমন্ত্রিত হলেন। মার্গারেটকেও নিমন্ত্রণ করা হল।

ভগিনী নিবেদিতা—



নিজের পাঠকক্ষে নিবেদিতা

বক্তৃতার বিষয় হল—ভক্তি।

বিবেকানন্দ আরম্ভ করলেন—"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়—"

উপসংহারে বললেন—"সমস্ত মানুষের মধ্যে যিনি রয়েছেন তিনি পরম এক এবং এই এককে যিনি সকলের মধ্যে সমভাবে দেখেছেন, তিনিই ভক্তির অধিকারী—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ—এই মহাবাণীর মধ্যেই নিহিত আছে ভক্তির মর্মকথা।

সকল শ্রোতাই মন্ত্রমুগ্ধের মত বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনলেন। স্তম্ভিত হলেন ভারতীয় সন্ন্যাসীর জ্ঞান ও বাগ্মিতার পরিচয় পেয়ে।

আর একদিন সভা বসল হাইড পার্ক গেট-এ মিসেস মার্টিনের বাড়িতে।

বক্তৃতার বিষয়বস্তু—আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা।

যথাসময়ে স্বামিজী এলেন। সেদিন তাঁর এক অপূর্ব বেশ।

পরিধানে কালো রঙের ইজের, কালো রঙের ভেস্ট, আলপাকার লম্বা চোগা, মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কালো মোটা কাপড়ের টুপি।

মনে হল যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক দেবদূত আলোকের রথ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

বিমুগ্ধনয়নে শ্রোতারা দেখলেন নবীন সন্ন্যাসীকে। মার্গারেটও বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বক্তৃতা শুরু হল।

কণ্ঠস্বর গম্ভীর, তেজোময় অথচ মধুর।

নচিকেতার গল্প দিয়ে বিবেকানন্দ সেদিনকার বক্তৃতার সূচনা করলেন :

অনন্ত স্বর্গসুখ কামনায় ঋষি গৌতম করলেন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। অতি কঠিন যজ্ঞ। হোমগন্ধে চারদিক ভরপুর, সামগানে চারদিক মুখরিত।

যজ্ঞশেষে রীতি অনুসারে যথাসর্বস্ব দান করবার জন্য প্রস্তুত হলেন ঋষি গৌতম।

ঋষিপুত্র বালক নচিকেতা পিতার কাছে বসে যজ্ঞ নিরীক্ষণ করছে।

দান করতে করতে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট রইল না। ঋষি গৌতম ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করলেন জরাজীর্ণ কঙ্কালসার গাভী।

সহজ সরল বুদ্ধিতে তখন নচিকেতা জিজ্ঞেস করল—"পিতঃ, আমায় কাকে দান করবেন?"

গৌতম অগ্রাহ্য করলেন পুত্রের কথা। কিন্তু বালক নিবৃত্ত হল না। একবার, দুবার তারপর তিনবার সে পিতাকে সেই একই কথা জিজ্ঞেস করল।

বিরক্ত হয়ে তখন গৌতম জবাব দিলেন—"মৃত্যবে ত্বা দদামীতি" —তোমায় মৃত্যুকে দান করব।

বালক সেই বাণীকে সত্য মনে করে নির্ভয়ে মৃত্যুর সন্ধানে চলল। সত্যানুসন্ধানে এ যেন ভারত-পথিকের পদযাত্রা!

বালক গিয়ে উপস্থিত হল যমভবনে। যমরাজ তখন অনুপস্থিত। তাঁর প্রতীক্ষায় নচিকেতা তিনদিন তিনরাত্রি অভুক্ত অবস্থায় বসে রইল।

যমরাজ তাঁর ভবনে উপস্থিত হলেন।

কিশোর বালককে দেখে ও তার সমস্ত কাহিনী শুনে যমের হৃদয়ে করুণার ভাব জেগে উঠল। বললেন—"বালক, তুমি তিনটি বর চাও।"

একে একে দুটি বর প্রার্থনা করে তৃতীয় বরে নচিকেতা আত্মজ্ঞান ভিক্ষা করল।

যম বিস্মিত হলেন। ক্ষুদ্র বালক চায় আত্মজ্ঞান! তিনি তাকে ভোগৈশ্বর্যের নানা প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু নচিকেতার মন তাতে

সাড়া দিল না। সে বলল—"যমরাজ, আপনি যে-সব ভোগ্যবস্তুর কথা বলছেন, সে সব ক্ষণস্থায়ী। আপনি আমাকে আত্মজ্ঞান দিন।"

যমরাজ তখন পবিত্র উষার গোধূলি লগ্নে জ্ঞানপিপাসু বালকের কানে দিলেন আত্মজ্ঞানের মন্ত্র। তারপর বললেন—"তত্ত্বমসি—তুমিই সেই, হে মানব, তুমিই সেই।"

মার্গারেটের মন ঝংকৃত হয়ে উঠল।

'হে মানব, তুমিই সেই···'

বেচারী মার্গারেট!

স্বামিজীর বক্তৃতা তাঁকে এমনভাবে স্তব্ধ, বিচলিত ও অভিভূত করবে তা কি তিনি আগে জানতেন?

কেন মানুষ এত পাগল হয় একটি সন্ন্যাসীর কথা শোনার জন্য!

কেন সুদূর আমেরিকা থেকে মিস ম্যাকলয়েড শুধু স্বামিজীর বক্তৃতা শোনবার জন্য ঘর ভাড়া করে আছেন লণ্ডনে? কেন শিক্ষিত যুবক গুডউইন সব কাজ ছেড়ে স্বামিজীর পিছনে ঘুরছেন তাঁর বক্তৃতা অনুবাদ করে দেবার জন্য?

জীবনের সব কিছু যেন মার্গারেটের ওলটপালট হয়ে যেতে লাগল।

কুহেলিকার আবরণ ভেদ করে ধীরে ধীরে একটি মানুষ যেন সূর্যের আলোকে প্রকাশ লাভ করবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু আকাশের কালো মেঘ তখনো আছে তাকে ঘিরে।

সে মেঘ সংশয়ের, সে মেঘ মায়ার, সে মেঘ অন্ধকারের।

অনেক সংশয়, অনেক মায়া, অনেক অন্ধকার কাটিয়ে যেতে হয় সেই সত্যের আলোকের পথে।

অনেক বাধা···অনেক ঝড় সেই পথে···

একদিন ঝড় উঠল স্বামিজীর আলোচনা-সভায়। অনেক বাদ-বিতণ্ডা, অনেক রূঢ় মন্তব্যের ঝড়…

কিন্তু স্বামিজী নির্ভীক…স্থির…অচঞ্চল। তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন—"জগতে আজ কিসের অভাব জান? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, 'ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল।' কে কে যেতে রাজী আছ বল?"

বলতে বলতে স্বামিজী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাকালেন শ্রোতৃবর্গের দিকে। যেন তাদের মধ্য থেকে তাঁর সঙ্গে কেউ যেতে রাজী আছে কিনা তাই তিনি দেখতে চান।

সে আহ্বান মার্গারেটের হৃদয়ে তীব্র আলোড়ন তুলল। মনে হল তিনি যেন এখনই উঠে দাঁড়াবেন।

কিন্তু সভার সকলে তখন নিশ্চল নির্বাক্। তাঁদের দিকে তাকিয়ে স্বামিজী আবার বললেন—"কিসের ভয়?" একটু থেমে বললেন—"যদি ঈশ্বর আছেন, একথা সত্য হয়, তবে জগতে আর অন্য কিছুতে কিসের প্রয়োজন? আর যদি একথা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেই বা ফল কী?"

স্বামিজী সভা ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু মার্গারেটের কানে বারে বারে সেই কথাগুলিই বাজতে লাগল—'যদি একথা সত্য হয়, তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন? আর যদি একথা সত্য না হয়, তবে জীবনেই বা ফল কী?'

'জগৎ চায় বিশজন নরনারী…সেই বিশজনের মধ্যে কি আমি একজন হতে পারি না?'

ধীরে ধীরে মার্গারেটের হৃদয়ে নতুন জীবন গ্রহণের সংকল্প দৃঢ় হতে লাগল।

মনের এই ভাব নিয়ে একদিন নির্জনে একাকী দেখা করলেন স্বামিজীর সঙ্গে। অকপটে বললেন সব মনের কথা।

স্বামিজী অবাক্ বিস্ময়ে তাকালেন আইরিশ তরুণীর দিকে।

তরুণীর দৃষ্টি তখন তাঁরই দিকে—জবাবের প্রতীক্ষায়।

আবেগময় কণ্ঠে স্বামিজী বললেন—"ভারতের নারীদের কল্যাণের জন্য আমার কতগুলি পরিকল্পনা রয়েছে। আমি তা কাজে পরিণত করতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি?"

মার্গারেট নীরব।

স্বামিজী বললেন—"আমার মনে হয় তুমি তা পারবে। পারবে তো?"

মার্গারেট জবাব দিলেন—"হ্যাঁ, পারব।"

স্বামিজী বললেন—"শুধু রাজী হলেই চলবে না, এর জন্য অনেক কিছু ত্যাগস্বীকার করতে হবে।"

মার্গারেটের মন থেকে বুঝি কেটে গেল সব বাধা—সব দ্বন্দ্ব। জবাব দিলেন—"হ্যাঁ, আমি এর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত।"

মার্গারেট নিজেকে যেন তাঁর জীবন-দেবতার পায়ে উৎসর্গ করলেন।

হৃদয়ের পবিত্র নির্মাল্য ঝরে পড়ল।

একটি চঞ্চল মন বহু পথের মধ্য দিয়ে নিজের পথ খুঁজে নেবার জন্য ব্যাকুল ছিল। এবার সে পথ পেল।

নূতন আলোকে নূতন চেতনায় এবার সে তাকিয়ে দেখল বিরাট পৃথিবীর সেই পথটির দিকে।

সে পথ ত্যাগের পথ—সেবার পথ—মুক্তির পথ।

ছয়

সেদিন ৭ই জুন।

সকালে উঠে কাজকর্ম সেরে স্কুলে যাবার জন্য তৈরা হচ্ছেন মার্গারেট। হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠল।

মার্গারেট দরজা খুলে দেখলেন, সহাস্যবদনে দাঁড়িয়ে আছেন গুডউইন। স্বামিজীর বক্তৃতার অনুবাদক ও তাঁর প্রিয় শিষ্য।

"গুড-মর্নিং! কি খবর? আলোচনা-সভা আছে নাকি?"

"না, আলোচনা-সভা নয়। চিঠি।"

গুডউইন একটি পত্র এগিয়ে দিলেন মার্গারেটের দিকে। বললেন—"স্বামিজী দিয়েছেন।"

"স্বামিজী দিয়েছেন? কী ব্যাপার! আলোচনা-সভা কবে হবে?"

"আর হবে না।"

"কেন?"

"আমরা শীগগিরই লণ্ডন ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

কথাটা যেন তীক্ষ্ণ শরের মত মার্গারেটের অন্তরে গিয়ে বিদ্ধ হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কোথায় যাচ্ছেন?"

"প্রথমে যাচ্ছি ফ্রান্স, তারপর জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড ও আরও কয়েক জায়গায় যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়ে গেছে আমাদের।"

ব্যাকুল ভাবে মার্গারেট প্রশ্ন করলেন—"তাহলে লণ্ডনে আবার কবে আসবেন?"

"সে কথা স্বামিজীই বলতে পারেন।"—পত্রটি মার্গারেটের হাতে দিয়ে চলে গেলেন গুডউইন।

মার্গারেট স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। কানে ভেসে এল গুড-উইনের কণ্ঠস্বর—"গুডবাই, মিস নোবল।" কিন্তু সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। কিছুক্ষণের জন্য যেন তিনি চেতনাবোধ হারিয়ে ফেললেন।

চেতনা ফেরার পর চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলেন মার্গারেট। স্বামিজী লিখেছেন—

"প্রিয় মিস নোবল,

আমার আদর্শ দু একটি কথায় বলা যেতে পারে। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে মনুষ্যসমাজে তা প্রকাশ করা এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এই দেবত্ব কিভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারা যায় তার উপায় নির্ধারণ করা।

কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই সংসার। পুরুষ হোক, নারী হোক, অত্যাচারিতের প্রতি আমি করুণা না করে পারি না। আবার যে উৎপীড়ক, সেও আমার অধিকতর করুণার পাত্র।

এই একটি ধারণা আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সকল দুঃখের মূল অজ্ঞতা, আর কিছু নয়। জগৎকে আলোক দেবে কে? অতীতে আত্মোৎসর্গ ই ছিল নীতি। হায়, কত যুগ পরে আমরা আবার তা ফিরে পাব? এই পৃথিবীর কল্যাণ-সাধনের জন্য যারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সাহসী, তাদেরই আজ আত্মোৎসর্গ করবার দিন। অনন্ত করুণা ও মৈত্রীতে পূর্ণ অসংখ্য বুদ্ধেরই আজ প্রয়োজন।

বর্তমানে পৃথিবীর সকল ধর্মই প্রাণহীন, অসার। জগতে এখন চরিত্রবলেরই প্রয়োজন। জগৎ এমন সব মানুষ চায় যাদের জীবন জ্বলন্ত, নিষ্কাম প্রেমের পূর্ণাহুতিস্বরূপ। সেই প্রেমের শক্তিতে উচ্চারিত বাক্য বজ্রের মত কাজ করবে।

তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে। ধীরে ধীরে এমনি আরও অনেক মানুষ আসবে। আমরা চাই সাহসপূর্ণ বাণী, আর চাই তার চেয়েও বেশী সাহসপূর্ণ কাজ।

হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো। জগৎ যন্ত্রণায় পুড়ে মরছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস আমরা আহ্বান করতে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত না হন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের দেবতা এই আহ্বানে সাড়া না দেন। জগতে এর চেয়ে বড় আর কী আছে, এর চেয়ে আর কোন্ কাজ বড়ো?

আমি কোন পরিকল্পনা করি না। আমার অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত কর্মপন্থা এসে পড়ে। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি—জাগো, জাগো।

অনন্তকালের জন্য আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ।”

চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেল।

মার্গারেট স্তব্ধ, অভিভূত।

কী জ্বলন্ত ভাষায় স্বামিজী তাঁর আদর্শকে ব্যক্ত করেছেন! কী স্পষ্ট তাঁর আবেদন!

‘হে মহাপ্রাণ জাগো! জগৎ যন্ত্রণায় পুড়ে মরছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?’

ধর্মের নামে, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের নামে, পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর কল্যাণ কামনায় স্বামিজীর এই ডাক যেন সারা আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

এতে কি সাড়া না দিয়ে পারা যায়?

সারা পৃথিবীর মানুষকে ডাক দিয়েছেন স্বামিজী।

জাগো!

জাগাতে হবে মানুষকে। সমস্ত দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে সেই ডাক।

ইওরোপের নানা দেশে অভিযান করার সংকল্প করলেন স্বামিজী।

ঠিক সেই সময়েই মিসেস সেভিয়ার ও মিস মূলার আমন্ত্রণ জানালেন স্বামিজীকে—"চলুন সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানকার মানুষ শুনতে চায় আপনার বাণী।"

পরিশ্রান্ত স্বামিজী গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। প্রথমে ফ্রান্সে যাবার যে পরিকল্পনা করেছিলেন আপাততঃ তা স্থগিত রইল।

ইচ্ছা ছিল, স্বাস্থ্যকর জায়গা সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে বিশ্রাম করবেন কিছুদিনের জন্য। কিন্তু বিশ্রাম তাঁর ভাগ্যে নেই।

'কার্য থেকে কার্যান্তরে গমনই হল বিশ্রাম!' স্বামিজীর এই অভিমত—এই হল তাঁর জীবনের আদর্শ।

ইওরোপের নানা দেশে ঘুরে বেদান্ত প্রচার করতে লাগলেন স্বামিজী। সেই সঙ্গে জানালেন উৎপীড়িত নিপীড়িত মানুষের বাণী। ভারতের মর্মবাণীও পৌঁছে দিলেন ইওরোপের আধুনিক শিক্ষায় গর্বিত মানুষের কাছে।

সেপ্টেম্বর মাসে স্বামিজী লণ্ডনে ফিরে এলেন।

এবারের লণ্ডন-জীবন যেন আরও চঞ্চল, আরও প্রবাহময়।

স্বামিজীর ভক্তসংখ্যা বেড়ে উঠেছে দিনের পর দিন। আধুনিক শিক্ষায় গর্বিত মানুষ মাথা নত করেছে এই সর্বহারা সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে।

স্বামিজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন মিস হেনরিয়েটা মূলার, মিঃ ই. টি. স্টার্ডি, মিস মার্গারেট নোবল, মিঃ সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী এবং আরো অনেকে।

প্রভূত সম্পদের অধিকারিণী মিস হেনরিয়েটা মূলার। স্বামিজীর

সঙ্গে ভারতে গমন করে তাঁর কাজে জীবন ও সম্পত্তি সমর্পণ করতে তিনি প্রস্তুত।

সেভিয়ার দম্পতি স্থির করেছেন তাঁরাও সঙ্গী হবেন স্বামিজীর। ভারতে গিয়ে হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়ে একটি আশ্রম স্থাপন করবেন। অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবেন নীরব তপশ্চর্যায়।

আর মার্গারেট ?···

স্বামিজীকে গুরুপদে বরণ করেছেন, কিন্তু কর্মপদ্ধতি এখনও স্থির করেন নি।

চিন্তাভারাক্রান্ত মন নিয়ে মার্গারেট একদিন গিয়ে দাঁড়ালেন স্বামিজীর সামনে। ভাবনায় তন্ময় স্বামিজীও। কিন্তু ওকি! চোখ অশ্রু ছলছল! মার্গারেট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

কী হয়েছে ?

কাতর নম্রকণ্ঠে স্বামিজী বলেন—"আমার দেশের দীন দরিদ্র অভাগা ছেলেরা অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ওদের কী হবে ?"

বুঝতে পারেন মার্গারেট। ভারতের দুঃখী অনাথ শিশুদের মলিন মুখের ছবি চোখের উপর ভেসে উঠতেই কাতর হয়ে পড়েছেন স্বামিজী।

মার্গারেটের চোখেও ভেসে ওঠে সেই ছবি। বেদনায় সিক্ত হয়ে ওঠে মন।

কম্পিত কণ্ঠে বলেন মার্গারেট—"যদি ভগবানের ইচ্ছা থাকে, আমি আপনার পাশে দাঁড়াব, একসঙ্গে কাজ করব এক উদ্দেশ্য নিয়ে।"

গুরুর 'কর্মযোগের' নতুন ব্যাখ্যা শিষ্যার দেহ মনে যেন এক নতুন আলোড়ন তোলে।

'এই কাজই আমাকে করতে হবে।' মনের মধ্যে বেজে ওঠে সেই সুর।

মার্গারেটের জীবনে ঘনিয়ে আসছে যেন এক চরম লগ্ন। পুরানো অন্ধকার থেকে এ যেন নতুন আলোয় উত্তরণ!

স্বামিজী বললেন—“ভারতবর্ষই তোমার স্থান। সেখানেই তোমাকে যেতে হবে। যাবে তো?”

আবেগজড়িত কণ্ঠে জবাব দিলেন মার্গারেট—“যাবো—নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু আমাকে তৈরী হতে দাও প্রভু—নিজেকে মুক্ত হতে দাও।”

“বেশ, তোমাকে তৈরী হবার জন্য—মুক্ত হবার জন্য সময় দিলাম।”

স্বদেশে ফেরবার জন্য বিবেকানন্দের মন তখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বিদেশে বেদান্ত প্রচারের কাজ বন্ধ করলে তো চলবে না। তাই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সে কাজে নিযুক্ত করলেন স্বামী অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে। তারপর তিনি ভারতে ফিরে আসার আয়োজন করতে লাগলেন।

স্থির হল, সেভিয়ার দম্পতি স্বামিজীর সঙ্গে যাবেন এবং সেক্রেটারিরূপে গুডউইনও যাবেন স্বামিজীর সঙ্গেই। মিস হেনরিয়েটা মূলার তাঁর এক সঙ্গিনী মিস বেল সহ কিছুদিন পরে যাত্রা করবেন।

মিস মার্গারেটের পক্ষে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুল রয়েছে, তার উপর নিজের কাঁধে রয়েছে সংসারের বিরাট দায়িত্ব। এ সবের ব্যবস্থা করে তিনি বছর খানেক বাদেই হয়তো যেতে পারবেন।

১৩ই ডিসেম্বর, রবিবার।

পিকাডিলির চিত্রশিল্পী সংঘের সভাগৃহে এক সভা বসল।

স্বামিজীর বিদায়-সংবর্ধনা সভা।

শত শত শ্রোতার সমাগমে সভাগৃহ পরিপূর্ণ। তবু চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। প্রায় সকলেরই চোখ অশ্রুসজল।

বেদনার্ত হৃদয়ে সকলে এসেছেন তাঁদের প্রিয় স্বামিজীকে বিদায় সংবর্ধনা জানাতে।

মার্গারেটও এসেছেন।

চারদিকের দেওয়ালে চিত্রশালার সুদৃশ্য ছবি। যে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে স্বামিজী তাঁর বিদায়-ভাষণ দেবেন তার চারদিক ফুলে ও পাতায় সাজানো।

সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে স্বামিজী সভায় প্রবেশ করলেন। সৌম্যমূর্তি, সর্বাঙ্গে ত্যাগের মহিমা, নয়নে জ্ঞানের বিমল জ্যোতি।

সভার পক্ষ থেকে উদ্বোধন সংগীত গাওয়া হল। সে সংগীতে বিদায়ের করুণ সুর।

স্বামিজী উঠলেন বিদায়-অভিনন্দনের জবাব দেবার জন্য। বক্তৃতা দিলেন অতি মধুর প্রাঞ্জল ভাষায়। পরিশেষে বললেন—"ইংলণ্ডের এই আতিথেয়তা আমি ভুলতে পারব না। ভুলতে পারব না আমার এই ভাইবোনদের। আবার আমি আসব—আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।"

সভাগৃহ করতালিতে মুখর হয়ে উঠল।

মার্গারেটের হৃদয় ভরে উঠল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে।

একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর প্রতি ইংলণ্ডবাসীদের এত শ্রদ্ধা, এত ভালবাসা!

মার্গারেটের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, চোখে এল অশ্রুর নীরব বন্যা।

সাত

স্বামিজী ভারতে ফিরে এলেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে এসে পৌছলেন কলকাতায়।

মঠ তখন আলমবাজারে।

মঠকে বড় করার জন্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিবেকানন্দের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। মিসেস বুল কিছুকাল আগে মঠ প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁকে যে অর্থসাহায্য করতে চেয়েছিলেন, স্বামিজী তা গ্রহণ করেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল, প্রকৃত অবস্থা ভালরূপে বিবেচনা করে কর্মপন্থা স্থির করবেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে তিনি আলমবাজার মঠ থেকে মিসেস বুলকে লিখলেন—"কলকাতায় ও মাদ্রাজে দুটি কেন্দ্র আমি খুলতে চাই।···সন্ন্যাসীদের জন্য একটি এবং মেয়েদের জন্য একটি। কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আগে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে আমার জীবনের ব্রত থেকে যাবে অসম্পূর্ণ।"

মেয়েদের জন্য যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন, তার পরিচালনার ভার মার্গারেটের হাতে তুলে দেবেন এই ছিল তাঁর মনের গোপন ইচ্ছা। ভারতের কোন নারী যাতে এই কাজে জীবন উৎসর্গ করেন, তার জন্যও স্বামিজীর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

বিবেকানন্দ বললেন—"জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার এবং ঐ উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধান শহরগুলিতে কেন্দ্র স্থাপন—কেবল পুরুষদের জন্য নয়, নারীদের জন্যও প্রয়োজন। কিন্তু বড় কঠিন সেই কাজ।

টাকা আসবে কোথা থেকে ? ধর্মবলে পাশ্চাত্য বিজয় করলে পাশ্চাত্য হতেই অর্থ সংগৃহীত হবে। মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কোন নারী কি পারে না এসব কাজের ভার নিতে ?"

১৮৯৭ সালের ১লা মে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তদের একত্র করে এক সভা ডাকলেন। সভায় তিনি সংঘগঠনের আবশ্যকতা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামানুসারে সংঘের নামকরণ হল। এ ভাবেই হল 'শ্রীরামকৃষ্ণমিশন'-এর প্রতিষ্ঠা।

মার্গারেট তখনও লণ্ডনেই আছেন। বেদান্ত প্রচারের কাজে সাহায্য করছেন। মাঝে মাঝে পত্র লিখছেন স্বামিজীর কাছে। ভারত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চাইছেন।

স্বামিজী ভারতের অনেক সংবাদ জানিয়ে নানা কথার পর লিখলেন—"প্রিয় মিস নোবল, তোমার যে মমতা, ভক্তি, বিশ্বাস ও গুণগ্রাহিতা আছে, তাতেই কেউ জীবনে যত পরিশ্রমই করে থাকুক, তার শতগুণ প্রতিদান হয়ে যায়। তোমায় সর্বাঙ্গীণ কুশল হোক।"

ভারতে কি কাজ হচ্ছে তা জানবার জন্য মার্গারেটের কৌতূহল ছিল অসীম। তাই সমস্ত পত্রে তিনি কাজের কথা জিজ্ঞেস করতেন। স্বামিজীও নিয়মিত তাঁকে সব খবর জানাতেন। সেভিয়ার দম্পতি নিভৃতে হিমালয়ের ক্রোড়ে আশ্রমজীবন যাপন করবেন। কিন্তু মার্গারেট তো সেজন্য ভারতে আসবেন না। তাঁর জীবন উৎসর্গিত হবে অজ্ঞ দুঃখী জনসাধারণের সেবায়। সেই আদর্শ নিয়েই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ তো সেই উদ্দেশ্যেই।

কিছুদিন পরে স্বামিজী লিখলেন—"কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে দুর্ভিক্ষ নিবারণই আমাদের কাছে প্রধান কর্তব্য। কয়েকটি

কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং কাজ চলছে—দুর্ভিক্ষ-সেবা, প্রচার এবং শিক্ষাদান। এখন পর্যন্ত অবশ্য খুব সামান্য ভাবেই কিছু কিছু কাজ চলছে।······তুমি এখন এখানে না এসে ইংলণ্ডে থেকেই আমাদের জন্য বেশী কাজ করতে পারবে। দরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্য ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।"

চিঠি পড়ে মার্গারেট হতাশ হলেন। যে সময় তিনি অধীরভাবে ভারতযাত্রার নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন, সেই সময় স্বামিজীর এই পত্রাঘাত তাঁকে আহত করল।

তিনি স্বামিজীকে সরাসরি কিছু না বলে মিঃ স্টার্ডি ও মিস মূলারকে সব কথা জানালেন। তাঁদের কাছ থেকেই স্বামিজী জানতে পারলেন, মার্গারেট ভারতে এসে মিস মূলারের সাথে একসঙ্গে কাজ করবার জন্য তৈরী হয়ে আছেন।

স্বামিজীর মত পরিবর্তন হল। স্বাগত জানিয়ে চিঠি লিখলেন মার্গারেটকে। লিখলেন—

"মিস নোবল, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ভারতের কাজে তোমার অশেষ সাফল্যলাভ হবে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী-সমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন।

"কিন্তু এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি যে কত ভয়ানক, তা তুমি ধারণা করতে পার না। এ দেশে আসবার পর তুমি নিজকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা। তারা শ্বেতাঙ্গদের, ভয়েই হোক বা ঘৃণায় হউক, এড়িয়ে চলে, এবং তারাও এদের তীব্র ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গরা তোমাকে ছিটগ্রস্ত মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে।······যদি এ সব সত্ত্বেও

তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।"

চিঠি পেয়ে মার্গারেটের সেদিন কী আনন্দ!

স্বামিজী তাঁকে ডেকেছেন। পূর্বাচলে যেন এসেছে নবারুণের আহ্বান!

মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন মার্গারেট। বললেন—"মা, আমি ভারতবর্ষে যাব। তুমি মত দাও।"

মা বললেন—"বেড়াতে যাবি? বেশ তো, এতে আপত্তির কি আছে?"

"না মা, বেড়াতে নয়। আমি চিরকালের মত চলে যাব।"

"সে কি!"—চমকে উঠলেন মা মেরী।

"হ্যাঁ মা, আমি যাবো ভারতবর্ষে।"

মেরীর মনে পড়ল অনেককাল আগে তাঁর স্বামীর এক ধর্মযাজক বন্ধু মার্গারেটকে দেখে বলেছিলেন—'ভারতবর্ষ থেকে তোমার ডাক আসবে।'···একি সেই ডাক?

অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠল মেরীর বুক। মেয়ে কি তাহলে সত্যি চলে যাবে তাঁদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য?

অশ্রু ছলছল হয়ে উঠল মায়ের চোখ। মার্গারেট তা দেখে বললেন—"সেই দেশে গিয়ে আমি নতুন করে জন্ম নেব, সেই দেশের সেবায় আমি জীবন উৎসর্গ করব। তুমি আশীর্বাদ কর মা।"

মেরী জিজ্ঞেস করলেন—"সেই অচেনা দেশে গিয়ে কার কাছে থাকবি?"

মার্গারেট জবাব দিলেন—"স্বামিজীর কাছে। স্বামী বিবেকানন্দ আমার গুরু।"

স্বামিজীর কথা শুনে মেরীর মনে যেন একটু আশা ও আনন্দের সঞ্চার হল। বললেন—"ওঃ, সেই হিন্দুযোগী! তিনি যে ভগবানের



শ্রীমা ও নিবেদিতা

সেবার জন্য ও তাঁর দেশের কাজের জন্য তোকে গ্রহণ করেছেন, একথা তো বলিস নি আমাকে ?"

মার্গারেট বললেন—"বলিনি পাছে তুমি কিছু ভাবো বা মনে কষ্ট পাও।"

মা করুণ হাসি হেসে বললেন—"কষ্ট পাবো কেন ? তবে শোন। তোর যখন জন্ম হয়নি তখন মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। বলেছিলাম, আমার যে প্রথম সন্তান হবে তাকে আমি তোমার সেবায় উৎসর্গ করব। ভগবান তাই বোধ হয় তোর জীবনকে এই পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।"

সে কথা শুনে ঝংকৃত হয়ে ওঠে মার্গারেটের অন্তর।

"তাহলে আমি যাব মা ?"

কিন্তু এত সহজেই কি মায়ের মন মেয়েকে বিদায় দিতে চায় ? অশ্রুসজল চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে।

মেরীর মনে পড়ে গেল আর একটি কথা। স্বামী মৃত্যুর আগে তাঁকে বলে গেছেন—'মার্গারেট বড় কিছু করবার জন্যই এ পৃথিবীতে এসেছে। ঈশ্বর নিজে তাঁর কাজের জন্য ওকে ডাকবেন। তুমি ওর এই নিয়তি নির্ধারিত পথে বাধা হয়ো না।'

স্বামীর অন্তিম অনুরোধ কেমন করে অবহেলা করবেন মেরী ? তাই অনুমতি দিতে হলো। করুণ কাতর কণ্ঠে বললেন—"শুধু একটা কথা আমাকে দিয়ে যা।"

"কি কথা মা ?"

"যেখানেই থাকিস, আমার অন্তিম সময়ে একটিবার এসে দেখা দিয়ে যাস।"

"হ্যাঁ, তাই যাবো মা।"

মার্গারেটের দিক থেকে আর কোন বাধা রইল না। তাঁর

নিজের হাতে গড়া রাস্কিন স্কুলের সমস্ত ভার তুলে দিলেন বোন মে-র হাতে।

ভারতযাত্রার জন্য মার্গারেট তৈরী হলেন।

যাত্রার দিনও স্থির হয়ে গেল।

বন্ধুবান্ধবেরা এক সভা ডেকে জানাল সংবর্ধনা। প্রার্থনা করল ভগবানের কাছে—'মার্গারেটের যাত্রাপথ যেন শুভ হয়।'

যাত্রার দিন অতি প্রত্যূষে মার্গারেট বাড়ি থেকে বের হলেন। চারদিক তখনো ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। প্রচণ্ড শীত। তবু অনেক আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব এসে উপস্থিত হলেন স্টেশনে। বিদায়-বেদনায় সকলের চোখই অশ্রুসজল।

'মম্বাসা' জাহাজ অপেক্ষা করছিল বন্দরে। তাতে এসে উঠলেন মার্গারেট। মা আর বোন কেঁদেই আকুল। লণ্ডনের কুয়াশাময় আকাশ থেকেও যেন নীরব অশ্রু ঝরছে।

মার্গারেট কিন্তু স্থির নির্বিকার।

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলেন মা ও বোনের কান্নাভরা মুখ, আত্মীয় ও বন্ধুরা রুমালে চোখ মুছছেন।

জাহাজ ছেড়ে দিল।

ইংলণ্ড পড়ে রইল পিছনে।

আট

সমুদ্রের নীল জলরাশি ভেদ করে চলেছে 'মম্বাসা' জাহাজ।

ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের উপকূল দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে। এক মহাদেশ ছেড়ে অন্য মহাদেশের দিকে এগিয়ে চলেছে যান্ত্রিক জলযান।

মার্গারেট জাহাজের ডেকে তখনও স্থির নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে। হাতে তাঁর গুরুদেব বিবেকানন্দের চিঠি। এই চিঠির ভেতর দিয়েই যে তিনি ডাক পেয়েছেন ভারতযাত্রার। এই চিঠিই তাঁর যাত্রাপথের একমাত্র সাক্ষী।

মার্গারেট নীল আয়ত চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে রইলেন নীল সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের দিকে।

সেই উচ্ছ্বসিত কল্লোল ধ্বনি যেন তাঁকে নতুন এক জগতের কথা শোনাচ্ছে।

১৮৯৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি।

মম্বাসা জাহাজ ভারতবর্ষের মাদ্রাজ বন্দরে এসে নোঙর ফেললো।

ভারতবর্ষ!

মার্গারেটের কল্পনার ধ্যানের ভারতবর্ষ।

ডেকে দাঁড়িয়ে মার্গারেট নীরব প্রণাম জানালেন তাঁর প্রিয় ভারতভূমিকে।

গুডউইন এলেন মার্গারেটের সঙ্গে দেখা করতে। বেশ কিছুদিন পর একটি পরিচিত মুখকে দেখতে পেয়ে মার্গারেট খুশী হলেন।

গুডউইনও তাঁরই মত স্বামিজীর কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন। একই পথের যাত্রী তাঁরা।

জাহাজ পরদিন বেলা দশটায় মাদ্রাজ ত্যাগ করল।

২৮শে জানুয়ারী এসে পৌঁছল কলকাতার বন্দরে।

কলকাতা!

স্বামিজীর জন্মস্থান—স্বামিজীর কর্মস্থল এই কলকাতা

সে কথা মনে হতেই মার্গারেটের মনে যেন রোমাঞ্চ জেগে উঠল।

জাহাজ এসে ভিড়ল বন্দরে। জাহাজ ঘাটায় অসংখ্য মানুষের ভিড়। তারই মধ্য থেকে স্বামী বিবেকানন্দ এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা জানাতে। আর একজন এসে পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।

মার্গারেট কিছুক্ষণের জন্য যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। পরকে আপন করে নেবার জন্য এখানকার মানুষের কী আগ্রহ কী সুন্দর তাদের ব্যবহার! এখানকার আকাশ বাতাসেও যেন মানুষকে আপন করে নেবার সুর।

স্বামিজী জিজ্ঞেস করলেন—"লণ্ডনের সবাই কেমন আছে? তোমার মা, বোন, ভাই? তোমার স্কুল?"

মার্গারেট মৃদু হেসে বললেন—"ভালো, সবাই ভালো।"

মার্গারেট তখনকার মতো চৌরঙ্গী অঞ্চলের এক হোটেলে উঠলেন। শীতের কুয়াশামাখা দিনগুলোর মধ্য দিয়ে শুরু হল তাঁর কলকাতার নাগরিক জীবন।

নূতন পরিবেশ নূতন অনুভূতি।

মার্গারেটের আগ্রহ জাগল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতার খুঁটিনাটি সবকিছু দেখবার আর নেটিভদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। ধীরে ধীরে সেই সুযোগও জুটে গেল। চৌরঙ্গী অঞ্চলে যে সব

ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন তাঁদের অনেকেরই সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই পরিচয় হয়ে গেল। প্রতিদিন সকালে ইডেন গার্ডেনে বেড়াবার সময় অনেক বিশিষ্ট ইংরেজ তাঁর সঙ্গী হতেন। মার্গারেট মনের আনন্দে দেখে বেড়াতেন কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য জিনিস—মিউজিয়াম, ফোর্ট উইলিয়াম, বোটানিকাল গার্ডেন প্রভৃতি। যেদিন সঙ্গী না জুটতো সেদিন নিজেই ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কলকাতার পথে বেরিয়ে পড়তেন।

মার্গারেট বুঝতে পারলেন এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হলে বাংলা শেখা দরকার। বিবেকানন্দ তা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি একজন সন্ন্যাসীকে পাঠিয়ে দিলেন মার্গারেটকে বাংলা শেখাবার জন্য।

বিবেকানন্দ এ-সময় বেলুড় মঠ তৈরির ব্যাপারে ভয়ানক ব্যস্ত—কাজেই মার্গারেটের প্রতি ভালরূপ নজর দিতে পারছেন না।

ফেব্রুয়ারি মাসে মিসেস সারা বুল ও মিস ম্যাকলয়েড বেলুড়ে এলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বললেন মার্গারেটের কথা।

মিস ম্যাকলয়েড কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"সে কি! মার্গারেট ভারতে এসে গেছে নাকি? সে কোথায় আছে?"

স্বামিজী বললেন—"সে আছে কলকাতায়।"

"অ্যাঁ, তাই নাকি?" তখনই তাঁকে বেলুড়ে তাঁদের কাছে নিয়ে আসার জন্য মিস ম্যাকলয়েড লোক পাঠালেন।

স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল নিজের মায়ের কাছে রেখে মার্গারেটকে একেবারে হিন্দু করে নেবেন। কিন্তু বেলুড়ে তাঁর একটা থাকবার জায়গা হয়ে গেল বলে আর ও ব্যাপারে এগোলেন না।

মার্গারেটের সঙ্গে আগেই ম্যাকলয়েডের পরিচয় ছিল। দু'জনেই দু'জনকে পেয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বেলুড়ে নদীর তীরে একটি পুরনো বাড়ি সংস্কার করে বাসের উপযোগী করা হয়েছিল। সেখানেই বাস করতে লাগলেন সারা বুল, ম্যাকলয়েড ও মার্গারেট।

মিসেস সারা বুল ছিলেন বিধবা, অনেক অর্থের মালিক। বোস্টনে তাঁর বাড়িতেই স্বামিজী আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বয়সে ছিলেন স্বামিজীর চেয়ে বড়। বেলুড় মঠের বাড়ি তৈরি করার ব্যাপারে এবং আরও অনেক কাজে স্বামিজীকে তিনি অর্থসাহায্য করেছিলেন। স্বামিজী তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ধীরা মাতা' এবং তাঁকে মা বলেই সম্বোধন করতেন।

ভারতবর্ষে স্বামিজীর বিদেশী শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা তখন সাত। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার, গুডউইন, হেনরিয়েটা মূলার, মিস ম্যাকলয়েড, মিসেস বুল আর মার্গারেট। গুডউইন মাদ্রাজে ছিলেন। স্বামিজীর নির্দেশে সেখানে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য করতেন।

মিস ম্যাকলয়েড ছিলেন বিদুষী ও ধনী মার্কিন মহিলা। ভারতে প্রথম এসেই স্বামিজীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"স্বামিজী, কিভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?"

স্বামিজী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—"ভারতবর্ষকে ভালবাস।"

কাজের জন্য যখন টাকা পয়সার খুব টানাটানি হল, তখন স্বামিজী সেকথা বললেন মিস ম্যাকলয়েডকে। ম্যাকলয়েড সঙ্গে সঙ্গে তিনশ ডলার স্বামিজীর হাতে তুলে দিলেন। তারপর প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ ডলার করে দেবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। স্বামিজীর দেহত্যাগের পরও ইনি বহুদিন বেলুড় মঠে বাস করেছেন এবং নানাভাবে রামকৃষ্ণ মিশনকে সাহায্য করেছেন।

স্বামিজী মিস ম্যাকলয়েডের নাম রেখেছিলেন 'জয়া'। অনেক সময় 'জো' বলেও সম্বোধন করতেন।

বিবেকানন্দ সারাদিনের কাজের ফাঁকে যতটুকু এই বিদেশী মহিলাদের সঙ্গে থাকতেন ততটুকু সময় তাঁর কী আনন্দেই না কাটত ! শিষ্যশিষ্যাদের কাছে তিনি নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার দিতেন খুলে। তাঁর

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে পাওয়া মহামূল্য বাণী অকাতরে বিতরণ করতেন।

বিবেকানন্দের সমস্ত উপদেশ মার্গারেট নিঃশব্দে শুনতেন। কোন বাদ-প্রতিবাদ করতেন না, কোন প্রশ্ন তুলতেন না। কিন্তু কোন কিছু গ্রহণ করবার সময় তার বিচার করতেন। তাকে পরখ করে নিতেন। এটাই ছিল মার্গারেটের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

মাঝে মাঝে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলতেন। নানা কথা বলতেন বিবেকানন্দ। কিন্তু কোন কাজের নির্দেশ তখনও দিতেন না।

মার্গারেটের মন তাতে ব্যাকুল হয়ে উঠত। তিনি ভাবতেন—এখানে আর্ত দুঃখী ছেলেমেয়েদের সেবা করব, বিদ্যালয় গড়ে তাদের শিক্ষা দেব—কই তার তো কোন আয়োজন দেখছি না।

বিবেকানন্দের ইচ্ছা হয়তো অন্যরকম। মার্গারেট এখনও বিদেশিনী। আগে তার হিন্দুত্ব প্রকাশিত হোক, তখন নিজেই সে এদেশের উপযোগী শিক্ষার কথা ভাবতে পারবে।

স্বামিজী তাই মার্গারেটকে, সীতা, সতী, সাবিত্রীর কথা বলেন, বলেন লীলাবতী, মৈত্রেয়ী ও গার্গেয়ীর কথা। একটু একটু করে মার্গারেটের চোখে হিন্দু রমণীর আদর্শের ছবি তুলে ধরেন।

একদিন গঙ্গার তীরে বসে আছেন গুরু ও শিষ্যা।

সন্ধ্যার অস্তমান রবির আলো ঝিকমিক করছে নদীর বুকে।

বিবেকানন্দ বললেন—"যদি তোমাকে ভারতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয় তবে তোমাকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবে চলতে হবে। আহার-বিহার, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই তোমার হবে হিন্দুর মতো। ভেবে দেখো, তুমি তা পারবে তো?"

মার্গারেট বললেন—"হ্যাঁ পারব।"

বিবেকানন্দ বললেন—"ভারতের অনেক বিদুষী ও ত্যাগব্রতে দীক্ষিতা নারীর কথা তোমাকে বলেছি। সেই রকম দীপ্তিশালিনী মহীয়সী নারী হয়ে তোমাকে ফুটে উঠতে হবে। অমৃতের উদাত্ত আহ্বানে ভারতের নারী যুগে যুগে যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, তুমি কি সে রকম হতে পারবে না?"

মার্গারেট বললেন—"পারব।"

বিবেকানন্দ আবার বললেন—"কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে ভুলতে হবে—এমন কি তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত রাখতে পারবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করে ভারতীয় সভ্যতাকে করুণার চক্ষে দেখতে পারবে না। ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ার মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে আর্ত ও দুঃস্থের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে হবে। মীরাবাঈয়ের মত এই ভারতবর্ষের জন্য সর্বসুখে জলাঞ্জলি দিতে হবে। বল পারবে তো?"

মার্গারেটের কণ্ঠে একই উত্তর—"পারব।"

বিবেকানন্দ গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন মার্গারেটের চোখের দিকে। দেখলেন সে চোখে রয়েছে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ভাব।

২২শে ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি।

২৭শে ফেব্রুয়ারি রবিবার সাধারণ উৎসব। সেই উৎসব হবে বেলুড়ে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়িতে।

স্বামিজী তাঁর বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের ঐ উৎসবে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

সবাই গেলেন। গেলেন মার্গারেটও।

মার্গারেট ও মিস মূলার স্থির করলেন উৎসবে যোগদানের আগে তাঁরা দক্ষিণেশ্বর দেখবেন।

হাওড়া থেকে নৌকা করে তাঁরা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হলেন। উৎসবের রেশ রয়েছে সেখানেও। জলে স্থলে সর্বত্রই যেন এক অভাবনীয় আনন্দের সাড়া!

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শয়নকক্ষে গিয়ে মার্গারেটের মনে এক স্বর্গীয় ভাব জেগে উঠল। তাঁর ঘরে নিজের ব্যবহার করা জিনিসগুলি ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে ভাবে রেখে গিয়েছেন, সেগুলি সে ভাবেই রয়েছে। মনে হয় তিনি যেন রয়েছেন ঐ ঘরটির মধ্যেই।

দেওয়ালে টাঙানো একটি ছবির দিকে চোখ পড়ল মার্গারেটের। মেরী ম্যাজডলেন নির্জন পরিত্যক্ত স্থানে ক্রুশবিদ্ধ ভগবানের পদতলে বসে করছেন কাতর প্রার্থনা।

কী করুণ! কী পবিত্র! কী সুন্দর!

এ যেন আর এক অনুভূতি। মার্গারেট মনে মনে অনুভব করলেন সর্ব ধর্মের সঙ্গেই মানুষের রয়েছে এক নিবিড় যোগাযোগ।

দক্ষিণেশ্বর দেখে মন তৃপ্ত হল। এবার গেলেন নৌকায় গঙ্গাপার হয়ে বেলুড়ে। ঘাটে নৌকা ভিড়াতেই কানে ভেসে এল উৎসবের কোলাহল।

বাইরের প্রাঙ্গণে সজ্জিত উৎসব মণ্ডপ, সংগীতধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। হাজার হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনবার জন্য।

মিসেস বুল, মিস ম্যাকলয়েড আগেই সেখানে এসে পৌঁছেছেন। এসেছেন জীর্ণবস্ত্র পরিধান করে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে 'গোপালের মা'।

গোপালের মায়ের নাম এই বিদেশী মহিলারা অনেক শুনেছেন। কিন্তু চোখে দেখেন নি।

মার্গারেটও গোপালের মাকে দেখলেন এই প্রথম। এই বৃদ্ধ মহিলাটি শ্রীরামকৃষ্ণকে গোপালরূপেই দর্শন করেছিলেন এবং সে

ভাবেই তাঁকে দেখতেন। তাই শ্রীমতী অঘোরমণি 'গোপালের মা' নামেই পরিচিত ছিলেন।

গোপালের মা এসেই মার্গারেটকে ও অন্যান্য বিদেশিনীদের চিবুক ধরে স্নেহ-চুম্বন করলেন। কেউ কারো ভাষা বোঝেন না, তাই আলাপ করতে পারলেন না। গোপালের মা তাঁদের হাত ধরে বাড়ির মেয়েদের মহলে নিয়ে গেলেন। মার্গারেট মুগ্ধ হলেন তাঁর মধুর ব্যবহারে।

এ ভাবেই বিদেশিনী মার্গারেট এ দেশের জনসমাজের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন।

কিন্তু এই জনসমাজের সঙ্গে আরও ভালরূপ পরিচয় হওয়া দরকার। আরও তাঁর মেশা দরকার সাধারণের সঙ্গে। স্বামিজীও তাই চান।

সেই উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে বক্তৃতার আয়োজন করলেন স্বামিজী। তিনি নিজেই হলেন সেই সভার সভাপতি।

বক্তৃতা দিতে উঠে স্বামিজী বললেন—"ইংলণ্ডের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি মিস্ মূলারের মত দানশীল উদারহৃদয় মহিলাকে, পেয়েছি পরম বিদুষী শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তকে। ইংলণ্ড আমাদের আরও একটি উপহার দিয়েছে—মিস মার্গারেট নোবল। তাঁর কাছে আমাদের অনেক আশা। বেশী কিছু না বলে মিস মার্গারেটের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।"

স্বামিজী একথা বলার পর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন মার্গারেট। বিপুল জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল, জানাল তাঁকে অন্তরের অভিনন্দন।

মার্গারেট বক্তৃতা দিলেন। ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব কিভাবে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সে কথাই ব্যক্ত করলেন জনগণের সামনে। স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে পাশ্চাত্যকে জয় করছেন—সে কথাও বললেন।

সে বক্তৃতায় দর্শকরা হলেন মুগ্ধ চমকিত।

১৮৯৮ সালের মার্চ মাসটি ঘটনাবহুল এবং মার্গারেটের জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটি থেকে এসে বাগবাজার বোস পাড়া লেনে বাস করতে লাগলেন।

মার্গারেট মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলয়েডের সঙ্গে গেলেন শ্রীমার দর্শনলাভ করতে। প্রথম দর্শনেই তাঁরা মুগ্ধ হলেন।

শ্রীমায়ের কাছে তাঁরা যেন কতকালের চেনা।

ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াতেই শ্রীমা বলে উঠলেন—"ঐ যে আমার মেয়েরা এসেছে।"

কেউ কারুর ভাষা বোঝেন না। অথচ কত সহজে সকলেই যেন সকলের আপন হয়ে গেলেন। নিয়তির কী বিচিত্র লীলা!

সকলকে অবাক্ করে দিয়ে শ্রীমা একত্র আহার করলেন সেই সব বিদেশিনীদের সঙ্গে। মার্গারেটের মনে হল এই পরম নিষ্ঠাবতী সহজ সরল হিন্দু মহিলার সংস্পর্শে এসে তিনিও যেন হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

পরশমণির ছোঁয়া মার্গারেটের জীবনে আগেই লেগেছিল, এতদিনে সেই ছোঁয়া হল সার্থক।

বেলুড়ে ফেরবার পথে সঙ্গী হলেন স্বামিজী। পথেই মার্গারেটকে বললেন—"আমি তোমাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করব।"

ঝংকৃত হয়ে উঠল মার্গারেটের অন্তর। এতদিনে তাহলে স্বামিজী তাঁকে কাছে টেনে নেবেন!

২৫শে মার্চ, মার্গারেটের জীবনের এক পরম শুভলগ্ন।

ঐদিন মঠে ঠাকুরঘরে পূজার আয়োজন ছিল। স্বামিজী মার্গারেটকে নিয়ে গেলেন পূজার ঘরে। বললেন—"মহাদেবকে দাও তোমার ফুল ও বেলপাতার অঞ্জলি।"

মার্গারেট তাই করলেন।

স্বামিজী বললেন—"মনকে সংযত কর। মনপ্রাণ সমস্ত অর্পণ কর ভগবানের চরণে। মনে রেখো তুমি জন্ম থেকেই ভগবানের চরণে নিবেদিত। এ জীবন তোমার নয়—এ জীবন ভগবানের। তাঁর ইচ্ছাতেই তোমার জীবন পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য উৎসর্গিত হবে।"

থরথর করে কেঁপে উঠল মার্গারেটের সারা শরীর।

স্বামিজী দীক্ষা দিলেন মার্গারেটকে।

অন্তরের পবিত্র নির্মাল্য নিবেদিত হল ভগবানের চরণে। মার্গারেট হলেন নিবেদিতা।

সুন্দর, পবিত্র নাম 'নিবেদিতা'। স্বামিজী দিলেন তাঁকে এই নূতন নাম।

মৃত্যু হল মার্গারেটের। নূতন করে জন্ম নিলেন একটি মহিমময়ী নারী—তিনি নিবেদিতা।

সঙ্ঘ-জননী সারদাদেবীর গুণে মুগ্ধা নিবেদিতা। ভারতের নারীরা তাঁর চোখে যেন এক নূতন সৃষ্টি।

নিবেদিতার একদিন ইচ্ছা হল, গুরুর গর্ভধারিণী জননী ভুবনেশ্বরীকে দেখবেন। গুরুর মুখে তাঁর কথা তিনি অনেকবার শুনেছেন। তিনি আরও শুনেছেন, সন্ন্যাসী হবার পরও স্বামিজী তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য মাঝে মাঝে কলকাতায় যান।

নিবেদিতা বললেন—"আমি দেখবো আপনার ভাগ্যবতী পুণ্যশীলা মাতৃদেবীকে।"

বিবেকানন্দ বললেন—"বেশ যাবে।"

একদিন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তিনি নিবেদিতাকে সিমলার গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়িতে। ভুবনেশ্বরীকে প্রণাম করলেন নিবেদিতা।

গুরু-জননী আশীর্বাদ করলেন। নিবেদিতা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য লজেন্স—মিষ্টি। সেগুলো বিলিয়ে দিলেন। নিবেদিতার বিনয়-মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন দত্ত পরিবারের সকলেই।

ভুবনেশ্বরীর প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেন নিবেদিতা।

গুরুর মুখেই একদিন শুনলেন নিবেদিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। এই মহর্ষির কাছেই বিবেকানন্দ প্রথম স্নেহাশীর্বাদ পেয়েছিলেন। তাই তাঁকে দেখবার জন্য নিবেদিতা ব্যাকুল হলেন।

স্বামিজী নিয়ে গেলেন তাঁকে জোড়াসাঁকোতে। নিবেদিতা দুটি গোলাপ ফুল নিয়ে মহর্ষির কাছে দাঁড়ালেন।

জ্যোতির্মণ্ডিত প্রশান্ত সৌম্যমূর্তির দিকে তাকিয়ে নিবেদিতার মস্তক আপনি অবনত হল। ফুল দুটি তাঁর হাতে দিয়ে প্রণাম করলেন। মহর্ষি করলেন আশীর্বাদ।

গুরুর কাছে নিবেদিতা শুনেছিলেন, অতুল ঐশ্বর্য ও ভোগ-বিলাসের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথের মনে যৌবনেই বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। সেই বৈরাগ্যই তাঁর জীবনে এনে দিয়েছে পরম সার্থকতা।

মহর্ষি অনেক কথা বললেন। প্রাচীন বেদ ও উপনিষদের মন্ত্রের জীবন্ত বিগ্রহ এই দেবেন্দ্রনাথের ধর্মোপদেশেই বিবেকানন্দের মনে এনে দিয়েছিল একদিন নূতন জীবনপ্রবাহ। আজ তাঁরই আশীর্বাদ ও বাণী নিবেদিতার জীবনেও মূল্যবান পাথেয় হয়ে রইল।

নিবেদিতার দীক্ষাদানের কয়েকদিন পরই স্বামিজী চলে গেলেন দার্জিলিংএ। তিনি অসুস্থ। তাই প্রয়োজন স্থান-পরিবর্তন ও বিশ্রাম। নিবেদিতার উপর দিয়ে গেলেন তাঁর নিজের কিছু কিছু কাজ দেখাশোনার ভার।

স্বামিজীর অসুস্থতার খবর পেয়ে কয়েকদিন পর মিস মূলার গিয়ে উপস্থিত হলেন দার্জিলিংএ। নিবেদিতাও যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। গুরু যদি বেশীরকম অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করবে কে?

স্বামিজী সে খবর কেমন করে জানতে পারলেন। টেলিগ্রাম করে নিষেধ করলেন নিবেদিতাকে—তিনি যেন দার্জিলিং না আসেন।

এর মধ্যে শুরু হল কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব।

শহরময় আতঙ্ক।

লোক মরতে লাগল। তার চেয়েও শোচনীয় অবস্থা হল আতঙ্কিত নরনারীদের। দিশাহারা হয়ে তারা কলকাতা ছেড়ে পালাতে লাগল।

নিবেদিতা অবিলম্বে সে খবর দার্জিলিং-এ পাঠালেন। স্বামিজী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভুলে গেলেন নিজের অসুস্থতার কথা। তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন কলকাতায়।

শুরু হল সেবাকার্য।

নিবেদিতা দাঁড়ালেন স্বামিজীর পাশে।

কলকাতার পথেঘাটে জঞ্জাল জমে আছে তা সরাবার লোক নেই। সেই জঞ্জাল থেকেই রোগ ছড়াচ্ছে আরও বেশী।

নিবেদিতা নেমে পড়লেন জঞ্জাল সরানোর কাজে। হাতে নিলেন ঝাড়ু আর কোদালি। নোংরা পথঘাট পরিষ্কার করতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে বাগবাজার পল্লীর যুবকেরাও অবশেষে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নেমে পড়ল।

স্বামিজী আনন্দিত ও তৃপ্ত নিবেদিতার এই সেবাকার্যে। তিনি বুঝলেন, তাঁর শিষ্য শুধু কর্মী নন তাঁর অন্তরে বিরাজ করছে চিরযুগের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

স্বামিজী নিবেদিতাকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ভীত পলায়নপর নরনারীদের মনে সাহস দিতে লাগলেন।

কিন্তু শুধু সাহস দিলেই চলবে না। আর্ত পীড়িত লোকের সেবা করতে হবে। রোগে দিতে হবে ওষুধ ও পথ্য।

সেজন্য অর্থ চাই—প্রচুর অর্থ।

স্বামিজী বললেন—"নিবেদিতা, তুমি খসড়া তৈরি কর আবেদন-পত্রের। সেই আবেদনপত্রে লোকদের মনে সাহস দাও, ধনীদের কাছে করো সাহায্য প্রার্থনা। আর একথাও প্রচার কর, রামকৃষ্ণ মিশন পীড়িতের যথাসাধ্য সেবা করবে, ভয় নেই, নিরাশ হবার কিছু নেই!"

সাহস নিয়ে, মনে ত্যাগের ব্রত নিয়ে কাজ করে চললেন নিবেদিতা। দু দিন ধরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে আবেদনপত্রের খসড়া তৈরি করলেন। তার বাংলা ও হিন্দী অনুবাদ করা হল।

পূর্ণ উদ্যমে এবার কাজ চলল। ভীতিগ্রস্ত নরনারীদের মনে হল সাহসের সঞ্চার।

নিবেদিতার কাজে বিরাম নেই। বিশ্রাম, নিদ্রা, আহার সব কিছুই ভুলে গেলেন তিনি!

সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়ে এল। নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন স্বামিজীকে —"এবার কি হবে?"

স্বামিজী বললেন—"নূতন মঠের জন্য যে জমি কেনা হয়েছে তা বিক্রি করে টাকা যোগাড় করব। তবু সেবার কাজ বন্ধ হবে না।"

কিন্তু ইচ্ছা যার মহৎ, ভগবান তার সহায় থাকেন। কাজেই জমি বিক্রি করতে হল না। আবেদনে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেল, পাওয়া গেল প্রচুর অর্থ।

প্লেগের প্রকোপ কমে এল।

বিপদমুক্ত হল কলকাতা।

স্বামিজী ভারতের নানাস্থানে পর্যটনে যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেলেন ধীরা মা, জয়া, নিবেদিতা, স্বরূপানন্দ এবং আরও অনেকে।

প্রথমে তাঁরা যাবেন আলমোড়া। সেভিয়ার দম্পতি আলমোড়ার নির্জনে আশ্রম গড়ে তুলেছেন। সেখানেই গিয়ে উঠবেন তাঁরা। তারপর যাবেন অন্যান্য জায়গায়।

পথে নৈনিতালে থামলেন। পাহাড়ের গায়ে রাজপ্রাসাদ। খেতড়ির মহারাজার আবাসস্থল। মহারাজ স্বামিজীকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। বিদেশিনীদের কাছে যেন এ এক নূতন রূপ। রাজদ্বারে সম্মান পায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—এ যেন ভারতবর্ষেই সম্ভব। ভারতেই রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে হয় সন্ন্যাসী।

বিকেলে প্রাসাদ-উদ্যানে স্বামিজী বক্তৃতা দিলেন। তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠল হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকল ধর্মের এক সমন্বয়ের সুর। নিবেদিতার মনে হল স্বামিজীর কাছে দেশ ধর্মের চেয়ে বড়ো। ভারতবর্ষই তাঁর সব কিছু। তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

নৈনিতাল থেকে তাঁরা চললেন আলমোড়ার দিকে। ডাণ্ডিতে চেপে মেয়েরা, আর সন্ন্যাসীরা ঘোড়ার পিঠে।

জঙ্গলের বুক চিরে পথ। পথের দুধারে নানা রঙের ফুলের শোভা। দেবদারু আর পাইনের মাথায় ঝিকিমিকি সূর্যের আলো। মার্গারেটের মনে আর আনন্দ ধরে না। ছেলেবেলার সেই পল্লীর জীবন যেন ফিরে পান তিনি। তাঁর ছেলেবেলার স্বদেশ আর যৌবনের এই দেশ যেন এক হয়ে মিশে যায়।

চারদিনে পথযাত্রা শেষ হল।

হিমালয়ের বুকে শান্ত নিবিড় আলমোড়া।

সেভিয়ার দম্পতি তাঁদের পুরোনো বন্ধুদের পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন।

এখানে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের সঙ্গে স্বামিজীর দেখা হল। বেশান্ত নূতন রূপে দেখলেন নিবেদিতাকে, ইওরোপীয় সভ্যতার উদ্যান থেকে মনোরম যে ফুলটি স্বামিজী চয়ন করে এনেছিলেন, সেই ফুলের



নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে এঁরা বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।
স্বামিজীর শিষ্যা ও শিষ্য মিসেস সেভিয়ার ও মিঃ সেভিয়ার



জয়া ধীরামাতা স্বামিজী নিবেদিতা

অপূর্ব বিকাশকে মুগ্ধ নয়নে প্রত্যক্ষ করলেন অ্যানি বেশান্ত। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশান্ত বুঝলেন, স্বামিজীর এই মানসকন্যা মনে প্রাণে ভারত-দুহিতা।

আলমোড়ায় স্বামিজী পুরানো অভ্যাস বজায় রেখে প্রতিদিন শিষ্যদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিতেন। সেই সময়ে শিক্ষাদানও চলত। এই শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল সাধারণ। সকলেই বারান্দায় অথবা বাগানে বসতেন।

মূল আলোচনার বিষয় থাকত প্রাচ্য জীবনযাত্রা, তার আদর্শ এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে তার পার্থক্য। সেই প্রসঙ্গে প্রাচ্য সভ্যতা এবং বিভিন্ন যুগের ইতিহাসও বর্ণনা করতেন স্বামিজী।

একদিন আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মুঘল ইতিহাস।

নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন—"আগ্রার তাজমহল আপনার কেমন লাগে?"

বিবেকানন্দ বললেন—"একটা অস্পষ্ট ম্লানিমা—একটা ক্ষীণ আভাস এবং অদূরে চিরবিশ্রাম।"

"সাজাহানকে আপনার কেমন মনে হয়?"

"এমন সৌন্দর্যবোধ আর দেখা যায় না। সম্রাট্ সাজাহান নিজে একজন কলাবিদ্ ছিলেন। আমি তাঁর নিজের হাতে লেখা একখানি পুঁথি দেখেছি। নিজের হাতে আঁকা ছবিও রয়েছে তাতে। সেটি ভারতীয় প্রতিভার গৌরব।"

একদিন শিবাজীর কথা বললেন স্বামিজী।

স্বামিজীর অতি প্রিয় ঐতিহাসিক চরিত্র শিবাজী। যেমন ছিল সেই মহারাষ্ট্রনায়কের বীরত্ব তেমনি ছিল তাঁর চাতুর্য। রায়গড়ে একবছর সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছিলেন। কেউ তাঁকে চিনতে পারে নি।

স্বামিজী বললেন—"আজ পর্যন্ত ভারতের রাজশক্তি সন্ন্যাসীদের ভীতির চোখে দেখেন, পাছে গেরুয়া বসনের ভেতর থেকে আবার একটা শিবাজী বেরিয়ে পড়ে।

"ভয়ের আরও একটা কারণ কি জান? শিবাজীর পতাকাও ছিল গেরুয়া রঙের।"

নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে যান স্বামিজীর কথায়। দেখতে পান যেন এই সন্ন্যাসীর মধ্যে লুকিয়ে আছে মহাপ্রাণ এক ঐতিহাসিক।

আলমোড়ায় প্রতিদিন বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা আরম্ভ হল, তা নিবেদিতার কাছে নূতন এবং অভাবনীয়। এ যেন নূতন করে পাঠশালায় পাঠ নেওয়া।

ইংলণ্ডের ক্লাসগুলিতে নিবেদিতা যেমন যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন, সে স্বভাব এখন আর নেই। তবু মাঝে মাঝে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া বাইরে তর্কের আকারে প্রকাশ হয়ে পড়ত।

নানা কথাবার্তায় ও আলোচনায় স্বামিজী বুঝতে পারলেন নিবেদিতা ভারতকে ভালবাসতে শুরু করেছেন সত্য কিন্তু মনে প্রাণে ভারতীয় হতে পারেন নি। দীক্ষালাভের পরেও ইংরেজজাতির প্রতি রয়েছে তাঁর প্রবল পক্ষপাতিত্ব ও অনুরাগ।

স্বামিজী মনে করলেন, নিবেদিতার মনের মণিকোঠায় লুকানো ঐ বিশ্বাসকে দূর করতে হলে ইওরোপীয় সমাজের তীব্র সমালোচনা করতে হবে। তাই যখনই সুযোগ পেতেন তখনই নিবেদিতাকে আক্রমণ করতে লাগলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামিজী একদিন চীনদেশের প্রশংসায় মেতে উঠলেন। নিবেদিতা তখন বলে উঠলেন—"কিন্তু স্বামিজী, চীন জাতির অসত্যপরায়ণতা একটি সর্বজনবিদিত দোষ।"

স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন—"অসত্যপরায়ণতা!

এটা অত্যন্ত আপেক্ষিক শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষতঃ অসত্যপরায়ণতার কথা বলতে গেলে, মানুষ যদি মানুষকে বিশ্বাস না করত, তাহলে বাণিজ্য, সমাজ অথবা যে-কোন প্রকার সংহতি একদিনও টিকতে পারত কি? যদি বল, শিষ্টাচারের খাতিরে অসত্যপরায়ণ হতে হয়, তবে পাশ্চাত্ত্যদের এ বিষয়ে যে ধারণা তার সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? ইংরেজ কি সকল সময়েই সকলের জন্য দুঃখ এবং সুখ বোধ করে থাকে?"

একদিন স্বামিজী নিবেদিতাকে বললেন—"তোমার যে রকম স্বজাতিপ্রেম, ও তো পাপ।"

স্বামিজীর সঙ্গে নিবেদিতার মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ ছিল। তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে নিবেদিতা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর আদর্শ ও যুক্তিগুলি নির্বিচারে গ্রহণ করবার মত ইচ্ছা নিবেদিতার ছিল না। তিনি নিজে যদি সাধারণ হতেন, তাহলে নিজ মতবাদ বা যুক্তি অনায়াসে বিসর্জন দিতেন। কিন্তু নিবেদিতার চরিত্রও অসাধারণ, তাঁর ব্যক্তিত্বও কিছু কম নয়। তার উপর ছিল প্রচণ্ড তেজ ও অভিমান। অসহায়ভাবে নিজেকে বিলুপ্ত করবেন, নিবেদিতার পক্ষে তা অসম্ভব। তাই স্বামিজীর সঙ্গে এই দ্বন্দ্ব।

তা ছাড়াও স্বামিজী যদি কোমলভাবে তাঁর মতবাদ নিবেদিতার কাছে উপস্থিত করতেন, তাহলে হয়তো হৃদয়ের আবেগবশতঃ নিবেদিতা কতকটা নত হতেন। ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার পাত্রের নিকট স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার অনেক সময়েই ঘটে থাকে। কিন্তু স্বামিজী সে চেষ্টা করেন নি। তিনি অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপস করতে রাজী ছিলেন না।

আর একটি বিষয় স্বামিজী বুঝেছিলেন, নিবেদিতার যে দৃঢ়

অনুরাগ, তা একান্ত তাঁরই প্রতি। এই ব্যক্তিগত বন্ধন নির্মমভাবে ছিন্ন করা প্রয়োজন।

স্বামিজীর এই মনোভাব উপলব্ধি করার পর থেকেই নিবেদিতার অন্তর ক্রমে যেন শূন্যতায় ভরে উঠতে লাগল।

কত মনোরম জায়গা এই আলমোড়া! স্বামিজীর আগমনে এর মহিমা যেন শতগুণ বেড়ে উঠেছে। বিশাল দেওদার গাছগুলি এখানকার নির্জনতার গভীরতাকে আরও গভীর করে তুলেছে।

শূন্যতাও যেন আজ পরিপূর্ণ।

কিন্তু নিবেদিতার অন্তর নিঃসঙ্গ ব্যথায় ভরপুর।

মানসিক দ্বন্দ্ব যতই প্রবল হোক, একটি বিষয়ে নিবেদিতা অটল ছিলেন। সেবাকার্যে জীবন উৎসর্গ করবেন বলে তিনি যে সংকল্প করেছিলেন, তা থেকে বিচ্যুত হবার কথা মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে উদিত হয় নি। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, এই সেবাকার্য কোন ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্কের উপর নির্ভর করবে না। কারও প্রীতির জন্য কাজ না করে শুধু কাজের জন্যই কাজ করে যেতে হবে।

আদর্শ জগতে বিপর্যয় ও স্বামিজীর কঠোর ব্যবহার, এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে নিবেদিতা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন।

সেই সংকট সময়ে তাঁকে সাহায্য করলেন স্বামী স্বরূপানন্দ। আলমোড়ায় থাকাকালীন স্বরূপানন্দ নিবেদিতাকে বাংলা শেখাতেন। তা ছাড়াও পড়াতেন গীতা এবং হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখাতেন।

নিবেদিতার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে খুবই ব্যথিত হলেন স্বরূপানন্দ। তিনি তাঁকে ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগলেন। নিবেদিতা সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে তা অভ্যাস করতে লাগলেন।

স্বরূপানন্দ বললেন—"দেখবে নিবেদিতা, এই ধ্যান অভ্যাসের ফলে তোমার মনে ধীরে ধীরে প্রশান্তির ভাব ফিরে আসবে।"

কী অসহনীয় মানসিক যাতনায় নিবেদিতা দগ্ধ হচ্ছেন তা তাঁর সঙ্গিনীরাও বুঝতে পারলেন। 'জয়া' অর্থাৎ মিস ম্যাকলয়েড নিবেদিতাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি স্থির করলেন স্বামিজীকে একথা জানাবেন।

তাই একদিন নিভৃতে স্বামিজীকে বললেন—"আপনার অভিপ্রেত কাজে নিবেদিতার যোগদানের মূল্য আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন। তবে কেন এত পীড়ন? নিদারুণ মর্মবেদনায় নিবেদিতা আজ অবসন্ন, শীগগিরই এই অবস্থার অবসান করুন।"

স্বামিজী নীরবে সব শুনলেন ও চলে গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ পর আবার এলেন।

নিবেদিতা ও জয়া তখন বারান্দায় বসে ছিলেন। জয়ার দিকে তাকিয়ে স্বামিজী বললেন—"তোমার কথাই ঠিক, এ অবস্থার পরিবর্তন একান্ত দরকার। আমি একলা জঙ্গলে যাচ্ছি নির্জন বাসের ইচ্ছায়। যখন ফিরে আসব, শান্তি নিয়ে আসব।"

তারপর স্বামিজী আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ শোভা পাচ্ছে নীরবে আকাশের এক কোণে। সহসা দিব্য-ভাবে যেন তাঁর অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল। বললেন—"মুসলমানেরা ঐ দ্বিতীয়ার চাঁদকে বিশেষ সমাদরের চোখে দেখে। এস, আমরাও এই নবীন চন্দ্রিমার সঙ্গে নবজীবন আরম্ভ করি।"

কথাগুলি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী হাত তুললেন। সেই মুহূর্তে বিদ্রোহী নিবেদিতা নতজানু হয়ে বসে পড়লেন স্বামিজীর পদপ্রান্তে।

স্বামিজী নীরবে তাঁর মানসকন্যার মাথায় হাত রাখলেন। প্রাণ খুলে করলেন আশীর্বাদ।

মনে হল আকাশের চাঁদ যেন হাসছে!

স্বামিজী চলে গেলেন।

সে রাত্রে ধ্যান করতে বসে নিবেদিতা অনুভব করলেন, তিনি এক অনন্ত সত্তায় মগ্ন হয়ে গিয়েছেন।

স্বামিজী একাকী চলে গেলেন অরণ্যবাসে। ফিরলেন তিন দিন পরে।

নিবেদিতা সেভিয়ার দম্পতির বাংলোয় গেলেন স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখলেন বাংলোর বাগানে ইউক্যালিপটাস ও গোলাপ গাছগুলির নীচে তিনি বসে আছেন। মুখমণ্ডলে অপরূপ প্রশান্তি, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। সত্যই তিনি শান্তি নিয়ে ফিরেছেন। নিবেদিতার মনও শান্তিতে ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

আলমোড়ার শান্তিময় জীবনযাত্রায় ঘনিয়ে এল আবার এক বিষাদ। খবর এল, গুডউইনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বামিজীকে যখন খবরটি জানান হল—কোন কথাই বলতে পারলেন না তিনি। কিছুক্ষণ স্থির নির্বাক্ ভাবে বসে রইলেন। তারপর তাঁর চোখের কোণে দেখা গেল জল। প্রিয় শিষ্যের মৃত্যুতে স্বামিজী যে বিশেষ বিচলিত হয়েছেন, তা বেশ বোঝা গেল।

বললেন—"আর নয়, আলমোড়া আর নয়। এখন চল।"

নিবেদিতারও আলমোড়ায় আর ভাল লাগছিল না। তিনিও বললেন—"চলুন!"

নয়

এবার কাশ্মীর।

নিবেদিতার শিল্পিমন কাশ্মীরের মনোরম দৃশ্যে মুগ্ধ হল। তিনি এই মধুর স্মৃতি অমর করে রাখলেন তাঁর রচনার মধ্য দিয়েঃ

"পথের দৃশ্য কী রমণীয়! কোথাও কৃষক আপন মনে গান গেয়ে চলেছে, কোথাও সাধু-সন্ন্যাসীরা আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে চলেছেন মন্দিরের দিকে।

পর্বতের সানুদেশে ফুটেছে কত রঙবেরঙের ফুল। মধ্যে শ্যামল উপত্যকা ও শস্যক্ষেত। চারদিকে তুষারে ঢাকা পর্বতমালা। পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত কত প্রাচীন কাহিনী, এখানে ওখানে কত ধ্বংসস্তূপ! অসমতল গিরিসংকটসমূহের কী মৌন মহিমা!"

একদিন সবাই নৌকায় বসে আছেন। সূর্য অস্ত গিয়েছে। চারদিকে সন্ধ্যার ম্লান আলোক। নদীতীরের বিশাল গাছগুলির ছায়া পড়েছে নদীর জলে।

সুন্দর প্রকৃতির লীলায় সবাই মুগ্ধ। সবাই নীরব। স্বামিজী বললেন—"ঈশ্বর শুধু খেলার জন্য আপনাকে জগৎরূপে বিকাশ করেছেন। অবতারেরা শুধু লীলার জন্যই এখানে এসে বাস করে থাকেন। খেলা—সব খেলা। খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন কেন? শুধু লীলা। আমাদের জীবনও তাই। ভগবানের সঙ্গে শুধু খেলা করে যাও। বল, এসব লীলা, লীলা!"

বিবেকানন্দের মুখে তত্ত্বলোকের এমন সহজ সুন্দর কথা শুনে নিবেদিতা মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। গভীর নির্জনতার মাঝে সেই গভীর তত্ত্ব তাঁর মনের তন্ত্রীতে যেন ঝংকার তুলল।

কাশ্মীরের দিনগুলি যথার্থই আনন্দের। ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে স্বামিজী নিবেদিতাকে নিয়ে একটি উৎসবের আয়োজন করলেন। আমেরিকান শিষ্যদের আনন্দদানের উদ্দেশ্যেই এই উৎসব। নৌকার দরজার উপর আমেরিকার একটি পতাকা টাঙ্গানো হল। ফুল ও পাতা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হল নৌকাটি।

স্বামিজী ভাষণ দিলেন। রচনা করলেন উৎসব উপলক্ষে একটি ইংরেজী কবিতা—'৪ঠা জুলাইয়ের প্রতি।' আমেরিকান শিষ্যদের সেই কবিতাটি উপহার দিলেন।

এরপর চললেন অমরনাথের পথে। কিন্তু শুনতে পেলেন, তুষারপাতে পথটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই সকলে গেলেন ইসলামবাদে। সেখানে দেখতে পেলেন একটি সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরের বাইরে শিক্ষাদানরত বুদ্ধের এবং বৃক্ষতলে বুদ্ধ জননী মায়াদেবীর মূর্তি দু'টি সত্যই অপূর্ব। নিবেদিতা মুগ্ধ হলেন প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের মহিমায়।

নিবেদিতার মনে পড়ল কয়েক বছর আগে বিলেতে থাকতে বুদ্ধের জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। নির্নিমেষ নয়নে এবার তাই তিনি তাকিয়ে রইলেন ধ্যানমৌন বুদ্ধমূর্তির দিকে।

নিজেও হয়তো ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন। হঠাৎ সম্বিত ফিরে এল স্বামিজীর ডাকে।—"চলো।"

"হ্যাঁ চলুন।" নিবেদিতা চলতে শুরু করলেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় নৌকায় বসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুললেন নিবেদিতা। স্বামিজী স্থিরভাবে সব প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। হিন্দুধর্ম,

বৌদ্ধধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান সে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে নিবেদিতাকে বুঝিয়ে দিলেন।

তারপর শুরু হল আবার পথ চলা। অবন্তীপুরের দুটি প্রাচীন কীর্ত্তি, বিজবেহার মন্দির এবং মার্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও তাঁরা দেখে এলেন।

তারপর বৈরীনাগ। সুন্দর সরলবৃক্ষ পরিবেষ্টিত পাহাড়ের পাদদেশে জাহাঙ্গীরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। সত্যি অপূর্ব!

রাত্রিবেলায় স্বামিজী বসলেন—সেই পাহাড়ের পাদদেশে একটি গাছের তলায়। নীরবে দর্শন করতে লাগলেন সেই নির্জন সৌন্দর্য। পাশে তাঁর নিবেদিতা।

স্বামিজী বললেন—"এই নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যেও আমি দেখতে পাই কর্মের প্রেরণা। সবাই কাজ করছে। প্রকৃতিও নীরবে বসে নেই।"

নিবেদিতা উল্লসিত হয়ে তাকালেন স্বামিজীর দিকে। কাজ! কাজের কথা কি বলবেন স্বামিজী!

স্বামিজী সত্যি সেদিন তুললেন কাজের কথা। বিদ্যালয় গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ঘুরছে, সে কথা প্রকাশ করলেন নিবেদিতার কাছে। বললেন—"তুমি নেবে সেই ভার?"

নিবেদিতা আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন—"হ্যাঁ, নেব। আপনি যে ভার দেবেন সে ভারই আমি নেব।"

"একলা চালাতে পারবে কি? একজন সহকারী তো দরকার।"

"না, সহকারীর দরকার নেই। অতি সামান্যভাবে কাজ আরম্ভ করতে চাই। ছোট ছেলেমেয়ে যেমন বানান করে পড়তে শেখে, আমিও তেমনি ধীরে ধীরে নিজের প্রণালী ঠিক করে নেব। তা ছাড়া আমার ইচ্ছা, এই শিক্ষার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ধর্মভাব থাকবে।"

"উৎসাহ বজায় রাখবার জন্যই কি তুমি একটা সাম্প্রদায়িক ভাব

রাখতে চাও? অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের বাইরে যাবার জন্যই একটা সম্প্রদায় তৈরি করতে চাও? তাই কি?"

"হ্যাঁ।"

স্বামিজী তাকালেন নিবেদিতার দিকে। অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলেন তাঁর চোখে কী এক অপূর্ব দীপ্তি!

অমরনাথ যাবার পথের বাধা এখনো দূর হয় নি। তবু স্থির করলেন স্বামিজী, সেখানে যাবেন।

কষ্ট সহ্য করার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে সবাই যাত্রা করলেন অমরনাথের দিকে।

কী দুর্গম সে পথযাত্রা!

পহলগাম ও চন্দনবাড়ির ছাউনিতে বিশ্রাম করে এগিয়ে চলতে লাগলেন তীর্থযাত্রীরা। সামনেই তুষারনদী। স্বামিজী আদেশ করলেন নিবেদিতাকে—খালি পায়ে হেঁটে নদী পার হতে হবে।

নিবেদিতা গুরুর আদেশ পালন করলেন।

এবার আবার চড়াইপথ ধরে যাত্রা। শেষনাগ হতে পাঁচশো ফুট উপর দিয়ে আর একটি পথ। অসম্ভব শীত, শীতে নিবেদিতার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল নিবেদিতা সব পথটাই পায়ে হেঁটে পার হন। কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে মায়া হল বিবেকানন্দের। নিবেদিতার জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করলেন।

শেষনাগে বিশ্রাম করে যাত্রিদল এলেন পঞ্চতরণীতে।

এবার আর বিশ্রাম নয়। এবার শেষযাত্রার পাড়ি।

শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন অমরনাথে উৎসব। আগের দিন রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে যাত্রিদল যাত্রা শুরু করলেন। ডাণ্ডী এবং ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে প্রায় দু' হাজার ফুট চড়াই অতিক্রম করতে হল। পাহাড়ের গা দিয়ে পথ।

নিবেদিতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখেন—বিচিত্র ফুলের সমারোহ।

চড়াইয়ের পর উতরাই, যেখানে উতরাই শেষ হয়েছে, সেখান থেকে অমরনাথের গুহা পর্যন্ত বরফ-ঢাকা পথ। গন্তব্যস্থানের মাইল খানেক আগে বরফ শেষ হয়েছে।

স্বামিজী ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিবেদিতা কতগুলি স্তূপের নীচে বসে স্বামিজীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যাত্রীরা বরফগলা জলে স্নান করছিলেন। স্বামিজী বললেন—"আমি স্নান করে আসছি, তুমি এগোও।"

দলে দলে তখন যাত্রীরা গুহার মধ্যে প্রবেশ করছে। নিবেদিতাও প্রবেশ করলেন। তাঁর দৃষ্টি রইল গুহার প্রবেশপথে—কখন স্বামিজী আসবেন।

বিশাল গুহা। তুষারময় শিবলিঙ্গটি মনে হয় যেন সিংহাসনে বসে আছেন। যাত্রীদের ভিড় আছে, কোলাহল আছে, কিন্তু কোন পাণ্ডা নেই। আড়ম্বরহীন পূজার আয়োজন।

স্বামিজী যখন গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর অন্য রূপ। সর্বশরীরে ভস্ম মাখা। শিবলিঙ্গের কাছে প্রণাম করলেন ভূমিষ্ঠ হয়ে। স্পর্শ করলেন শঙ্করের শ্রীপাদপদ্ম!

ভাবাবেশে স্তব্ধ হয়ে রইলেন স্বামিজী কিছুক্ষণের জন্য।

নিবেদিতাও স্তব্ধ!

ধ্যানমগ্ন মহাযোগী শিবকেই যেন তিনি এখানে তাঁর গুরুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন।

কেটে গেল জীবনের কয়েকটি পরম মুহূর্ত। নিবেদিতার এবং স্বামিজীরও।

দু'জনেই গুহার বাইরে এলেন। রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে বহু যাত্রী তাঁদের হাতে বেঁধে দিয়ে গেল রক্ত এবং পীতবর্ণের রাখী।

সার্থক হল অমরনাথ তীর্থযাত্রা।

শ্রীনগরে পৌঁছে শিবময় স্বামিজী। ধ্যানগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—“জান নিবেদিতা, আমি অমরনাথে কি পেয়েছি?”

নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন—“কি?”

গম্ভীর কণ্ঠেই জবাব দিলেন স্বামিজী—“ইচ্ছামৃত্যু বর।”

শুনে কেঁপে উঠল নিবেদিতার অন্তর।

পর মুহূর্তেই আবেগময় স্বর ফিরে এল স্বামিজীর কণ্ঠে। নিবেদিতার হাত চেপে ধরে বললেন—“তুমি বলো না, কাউকে একথা বলো না।”

স্বামিজী শুধু ভ্রমণ করবার জন্যই বের হন নি। তাঁর অনেক কাজ ছিল। তাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন একদিন দল থেকে।

লাহোর হয়ে ১৮ই অক্টোবর স্বামিজী কলকাতায় ফিরে এলেন। নিবেদিতা, ধীরা মা এবং জয়াকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী সারদানন্দ ভ্রমণ করতে গেলেন দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ নগরগুলি।

কিন্তু নিবেদিতার আর প্রমোদ ভ্রমণ ভালো লাগল না। কাজের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাই কাশী হয়ে একাই ফিরে এলেন কলকাতায়।

স্বামিজী তখন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। হাওড়া স্টেশন থেকে নিবেদিতা সোজা চলে গেলেন সেখানে।

বোসপাড়া লেনে ১০।২ নম্বর বাড়িতে থাকতেন শ্রীমা সারদাদেবী। স্বামিজী সেই বাড়িতেই নিবেদিতার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

শ্রীমা সাদরে গ্রহণ করলেন নিবেদিতাকে। কিন্তু সেজন্য তাঁকে অনেক সামাজিক গোলযোগের সম্মুখীন হতে হল। বিদেশী মাত্রেই আচারের ধার ধারে না, হিন্দুসমাজের ভেতর এরূপ ভ্রান্ত ধারণাই হল এই গোলযোগের কারণ। কিন্তু শ্রীমা এ ব্যাপারে নির্ভীক আচরণ করলেন। গ্রাহ্য করলেন না সমাজের ভ্রূকুটি। সে যুগের রক্ষণশীলা এবং ব্রাহ্মণকন্যার পক্ষে এমন মনোভাবের পরিচয় দেওয়া সহজ কথা নয়।

আট দশ দিন পর অবশ্য নিবেদিতার জন্য আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা হল। শ্রীমার বাড়ির প্রায় উলটো দিকে ১৬ নং বাড়ি।

নিবেদিতা সেই বাড়িতে উঠে গেলেন। শ্রীমা বললেন—"তুমি আসবে—রোজ আসবে আমার কাছে। বুঝলে তো?"

নিবেদিতা বললেন—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব। আপনার কাছে না এসে কি থাকতে পারি?"

সত্যি নিবেদিতা রোজ আসতেন শ্রীমায়ের কাছে। নিবেদিতা যে ঘরে থাকতেন সে ঘরটা ছিল খুব গরম। গরমে নিবেদিতার খুব কষ্ট হত।

সারা গায়ে ঘামাচি দেখা দিল নিবেদিতার।

শ্রীমা তা দেখে বললেন—"ইস, দেখ মেয়ের কি দশা হয়েছে! সারা গা ঘামাচিতে একাকার!"

বলে নিজেই চটচট করে কয়েকটা ঘামাচি গেলে দিলেন। তারপর বললেন—"এই গরমের সময়টা তুমি রোজ দুপুরবেলা আমার এখানে এসে বিশ্রাম করবে।"

নিবেদিতা তাই করতেন। শ্রীমায়ের ঘরটি ছিল ঠাণ্ডা। চকচকে লাল মেঝের উপর সারি সারি মাদুর বিছানো। তার উপর এক একটি করে বালিশ ও মশারি। নিবেদিতা সেই মাদুরের উপর দুপুর বেলা শুয়ে বিশ্রাম করতেন।

কিন্তু তাতেও কি কম বাধা ?

সে ঘরে প্রায় সব সময়েই থাকতেন গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি। তাঁরা সবাই বিধবা। সেকালের বিধবাদের মতই তাঁদের আচার-নিষ্ঠা।

গোপালের মা অবশ্য চিনতেন নিবেদিতাকে—তাঁকে স্নেহও করতেন। কিন্তু তাই বলে এক ঘরে বিদেশী খ্রীষ্টানের সঙ্গে বাস !

"ওমা গো, কী ঘেন্না !" বলেই ফেললেন যোগীন-মা।

লক্ষ্মীদিদিও সায় দেন—"তাই তো! এদের ছুঁলেও যে জাত যায় !"

গোলাপ-মা বলেন—"এরা যে মেলেচ্ছর জাত !"

কিন্তু অদ্ভুত শ্রীমায়ের ব্যবহার। তিনি অক্লেশে ছোঁয়াছুঁয়ি করেন এই খ্রীষ্টান মেয়েটিকে।

শ্রীমা বলেন—"সবাই তো ভগবানের সৃষ্ট জীব, এর আবার জাতের বিচার কি ? ওরা যে আমার মেয়ে।"

তাই তো ! মেয়ে যদি ছোট জাতের ঘরে যায় তবে কি কেউ তাকে ফেলে দেয় ?

ভাবনায় দোলা লাগে আচার-নিষ্ঠ হিন্দু বিধবাদের মনে ! এতদিনের সংস্কারের বাঁধ বুঝি তাঁদের ভেঙে যায়।

নিবেদিতাকে আর ম্লেচ্ছ অস্পৃশ্য বলে মনে হয় না কারুর। ধীরে ধীরে সবাই যেন এক হয়ে যান।

নিবেদিতা জানেন—জাতিভেদ আর কিছুই নয়, অজ্ঞানতা-প্রসূত কুসংস্কার মাত্র। আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা যত বাড়বে, ঐক্যানুভূতিও তত প্রবল হবে। আর সেই সঙ্গে মানুষ চলে যাবে সব রকম সংস্কারের ঊর্ধ্বে।

তাই তিনি চুপ করে থাকেন। জোর করে কারুর সংস্কারে আঘাত করতে চান না।

এ ব্যাপারে নিবেদিতাকে কত অসুবিধায় পড়তে হয়েছে কত

সময়। হয়তো তাঁর মনে ব্যথাও লেগেছে। কিন্তু সেজন্য মুষড়ে পড়েন নি তিনি। কারণ তিনি জানেন এই সংস্কার হিন্দুধর্মে নেই, এই সংস্কার রয়েছে মানুষের মনে। একদিন তা দূর হবেই।

স্বামিজী একদিন এসে বললেন—"তোমার স্কুলের ব্যবস্থা তো প্রায় হয়ে এল। এখন তৈরী হও।"

নিবেদিতা বললেন—"তৈরী আমি হয়েই আছি।"

স্বামিজী বললেন—"জান, আমাদের দেশের নারী জাতিকে জাগাতে হবে। তাদের উন্নতি করতে হবে। নারী জাতি না জাগলে ভারত যে জাগবে না। সেটাই হবে তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ।"

নিবেদিতা বললেন—"হ্যাঁ, তা জানি।"

স্বামিজী বললেন—"তোমার উপর দেব এ দায়িত্ব। পুরুষদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়, এ তার চেয়ে অনেক বড়ো।"

একটু থেমে নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে অগ্নিদহন তোমার মাঝে থাকা উচিত তা নেই। তোমাকে হতে হবে জ্বলন্ত অগ্নির শিখা। শিব! শিব!"

স্বামিজী নিবেদিতার জন্য মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

দশ

দীপান্বিতা।

ঘরে ঘরে প্রদীপমালার শোভা। কলকাতা নগরী সেজে উঠেছে অপরূপ সাজে। গলিতে রাজপথে কুটীরে প্রাসাদে জ্বলে উঠছে রাশি রাশি প্রদীপ।

কিন্তু মানুষের মনে প্রদীপ জ্বালাবার ব্যবস্থা কোথায়? কে দৃষ্টি দেয় সেদিকে?

আজ এই পুণ্য তিথিতে নিবেদিতাই সেই ব্যবস্থা করলেন। বাগবাজারের একটি ছোট্ট গলিতে জ্বালালেন আলো। সে আলোর শিখা জ্বলবে বাইরে নয়—মানুষের মনে। সে আলোর জ্যোতি হবে অনির্বাণ।

বোসপাড়া লেনে আজ নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এই উৎসবে স্বামিজী এলেন। এলেন সঙ্ঘ-মাতা সারদা দেবী। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দও এসে উপস্থিত হলেন।

প্রথমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা হল। তারপর হোম।

শ্রীমা করলেন বিদ্যালয়ের উদ্বোধন। প্রতিষ্ঠানের উপর ভগবতীর মঙ্গলাশিস প্রার্থনা করলেন শ্রীমা। তারপর করলেন বিদ্যালয়ের ভাবী ছাত্রীদের আশীর্বাদ।

নিবেদিতার স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলল।

সারদা দেবী, স্বামিজী এবং আর সকলে নিবেদিতাকে আশীর্বাদ

করলেন। বিবেকানন্দ নিজে বিদ্যালয়ের নামকরণ করলেন—'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'।

কলকাতায় এক ছোট গলিতে দীপান্বিতার উৎসব সেদিন সার্থক হল।

১৪ই নভেম্বর বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হল। বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দ এসে উপস্থিত হলেন।

স্কুল শুরু হল। কিন্তু অভিভাবকরা মেয়ে দিতে চান না। মনে তাঁদের দ্বিধা—হিন্দুর মেয়ে যাবে বাড়ির বাইরে পড়তে! তাও আবার খ্রীষ্টান মেয়ের কাছে?

প্রথম ছাত্রী-সংখ্যা হল তিনজন। স্বামী সদানন্দ যোগাড় করে নিয়ে এলেন। স্বামিজীর নির্দেশে স্বামী সদানন্দ নিবেদিতাকে সাহায্য করেন নানা কাজে।

ছাত্রী কম হলেও নিবেদিতা দমলেন না। তিনটি মেয়ে নিয়েই শুরু করলেন কাজ। তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল মেয়েদের সংখ্যা।

চেষ্টা ও বিশ্বাসের জোরে অল্পদিনের মধ্যেই নিবেদিতা অনেক বাধা ও বিঘ্নকে কাটিয়ে উঠতে লাগলেন। বাগবাজার পল্লীতে পরিচিত হয়ে উঠল একটি নাম—সিস্টার নিবেদিতা।

সুখ্যাতি সবার মুখে মুখে।

কী সুন্দর শিক্ষাধারা! কী মধুর ব্যবহার এই বিদেশিনী মহিলার! অল্পদিনেই এ দেশের মেয়েদের আপন করে নিলেন।

যে মেয়েরা পড়াশোনার নামে ভয় পেত তাদের ভেতর জেগে উঠল কী দারুণ উৎসাহ। সবাই যেন স্কুলে যাওয়ার জন্য পাগল।

রোজ স্কুল শুরু হওয়ার আগেই ছোট ছোট মেয়েরা এসে ভিড়

করে নিবেদিতার চারদিকে। হাসিমুখে নিবেদিতা তাদের নিয়ে খেলা করেন।

মেয়েরা বলে—"সিস্টার, গল্প বলো।"

ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা কথায় ছোট ছোট গল্প বলেন নিবেদিতা।

মেয়েদের হাতে তুলে দেন রং ও তুলি। বলেন—"ছবি আঁকো, আঁকো তোমাদের যা খুশী।"

মাটি দেন পুতুল গড়বার জন্য। ছোট ছোট টুকরো কাপড়ের ওপর সেলাই শেখান। উৎসাহ দেন, আদর করেন সবাইকে। একবার না পারলে বার বার দেখিয়ে দেন। বিরক্তি নেই, অবসাদ নেই নিবেদিতার মনে।

সরস্বতীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি নিবেদিতা।

একদিন একটি মেয়ে লাইন টানছে স্লেটে। নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন—"কি করছ?"

মেয়েটি বলল—"লাইন টানছি।"

"লাইন? ওটা তো ইংরেজী শব্দ। তোমার নিজের ভাষায় বল।"

মেয়েটি অবাক্। বরাবর লাইন কথাটিই তারা জেনে এসেছে। এর বাংলা প্রতিশব্দ তো তারা জানে না। বলল—"আমরা তো এটাকে লাইনই বলি সিস্টার।"

দুঃখের হাসি হেসে নিবেদিতা বললেন—"তোমরা নিজেদের ভাষাও ভুলে গেলে?"

হঠাৎ একটি ছাত্রীর মুখ দিয়ে বের হল—"রেখা।"

"ঠিক বলেছ, রেখা! রেখা! আঃ কী সুন্দর নাম। দেখ তো, নিজের দেশে এত ভাল কথা থাকতে পরের দেশের কথা শিখছ। আমারও ভয়ানক ইচ্ছা করে আরও ভাল করে এই বাংলা ভাষা শিখতে।"

মেয়েদের অভিভাবক এবং পাড়ার লোকদের কাছে নিবেদিতা ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন অতি আপন জন। পথে যাঁর সঙ্গে দেখা হয় মধুর হেসে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, কুশল প্রশ্ন করেন।

নিবেদিতার বাড়িতেও কোন অতিথি এলে প্রতিবেশীদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় প্রয়োজনীয় জিনিস যোগানো এবং আহারের ব্যবস্থা করা। নিবেদিতারও প্রতিবেশীদের উপর অসীম স্নেহ ও ভালবাসা। তাঁদের সুখদুঃখের প্রতিও নিবেদিতার সতর্ক দৃষ্টি।

তাঁর বাড়ির উলটো দিকে আছে একটি ছোট মাটির বাড়ি। একদিন রাত্রে তিনি খেতে বসেছেন, হঠাৎ সেই বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এল।

খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন নিবেদিতা। ছুটে গেলেন সেই বাড়িতে। গিয়ে দেখলেন একটি ছোট মেয়ের এইমাত্র মৃত্যু হল। শোকে অধীর সেই মেয়েটির মা। নিবেদিতাও স্থির থাকতে পারলেন না। শোকাতুরা জননীর মাথাটি নিজের কোলে নিয়ে নীরবে বসে রইলেন। বহুক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটির মা অবসন্ন হয়ে পড়ল। হঠাৎ আবার কান্নার রোল তুলে সে বলে উঠল—"আমার মেয়ে কোথায় ?"

নিবেদিতা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"তোমার মেয়ে এখন মা কালীর কাছে আছে। কেঁদো না।"

বিদেশিনীর এই আশ্বাসে মেয়ের মা সত্যি কান্না ভুলে গেল। নীরবে তাকিয়ে রইল নিবেদিতার দিকে। নিবেদিতার মনে হল তিনি এই পরিবারেরই যেন একজন ; তাদের সুখদুঃখের ভাগী।

সেই বছর কলকাতায় আবার শুরু হল প্লেগের আক্রমণ। এক বছর যেতে না যেতেই আবার সেই মারাত্মক ব্যাধির আবির্ভাব কলকাতার মানুষকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলল।

স্বামিজী রোগ প্রতিরোধের সমস্ত ভার তুলে দিলেন নিবেদিতার হাতে।

রামকৃষ্ণ মিশন একটি কমিটি গঠন করল। নিবেদিতা হলেন তার সম্পাদিকা। সঙ্গে রইলেন স্বামী সদানন্দ ও অন্যান্য কর্মী। অবিলম্বেই কাজ শুরু হয়ে গেল। অপরিচ্ছন্ন বস্তিগুলিই ছিল রোগের ডিপো। নিবেদিতার নির্দেশে বাগবাজার ও শ্যামবাজারের সেই বস্তিগুলি পরিষ্কার করার কাজই আগে হাতে নেওয়া হল।

অর্থের জন্য নিবেদিতা ইংরেজী সংবাদপত্রে আবেদন প্রচার করলেন। অর্থসাহায্য কিছু কিছু আসতে লাগল।

ক্লাসিক থিয়েটারে হল এক সভার আয়োজন। স্বামিজী সভাপতি। নিবেদিতা তাতে বক্তৃতা দিলেন। তিনি আবেদন জানালেন তরুণ ছাত্রসমাজের কাছে—"এগিয়ে এসো তোমরা। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। দেশকে এ বিপদ্ থেকে রক্ষা করো। সেবাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। সেই ধর্মভাব ফুটে উঠুক উজ্জ্বল হয়ে তোমাদের চরিত্রের মধ্যে।"

নিবেদিতার ভাষণে সাড়া জেগে উঠল তরুণ ছাত্রসমাজের মধ্যে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অনেক ছাত্র এগিয়ে এল সেবার কাজে।

সমস্ত কাজ দেখাশোনার ভার নিবেদিতার উপর। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় রামকান্ত বসু স্ট্রীটে সমস্ত কর্মীরা এসে কাজের হিসাব দিতেন এবং নিবেদিতার কাছ থেকে নতুন কাজ বুঝে নিতেন। তবু নিবেদিতা নিজে ছুটে যেতেন প্রতিটি কেন্দ্রে। নিজের হাতে রোগীর শুশ্রূষা করতেন।

বাগবাজারের বস্তিতে এক ডাক্তারের উপর চিকিৎসার ভার ছিল। সেই ডাক্তার একদিন রোগী দেখে বাড়ি ফিরতেই দেখলেন তাঁর ঘরের বাইরে জীর্ণ তক্তপোশের উপর নিবেদিতা বসে আছেন।

"কি ব্যাপার! আপনি এখানে?" ডাক্তার অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

নিবেদিতা একটি বিশেষ শিশুরোগীর খবর জানবার জন্য এসেছিলেন। কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজে গিয়ে খবর নিতে পারেন নি।

ডাক্তার বললেন—"অবস্থা খুবই খারাপ, বাঁচে কিনা সন্দেহ।"

নিবেদিতা ছুটে গেলেন বস্তির সেই বাড়িতে। স্যাঁতসেঁতে জীর্ণ কুটীরে সেই শিশুর সেবার ভার নিলেন। ঘরের অপরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখে মনে খুবই দুঃখ হল নিবেদিতার। ছোট একটি মই যোগাড় করে নিজেই সেই ঘরের চুনকাম করলেন। রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও রাত জেগে শুশ্রূষা করতে লাগলেন শিশুটির।

দুদিন পরে নিবেদিতার কোলেই শিশুটি মারা গেল। মৃত্যুর আগে তাঁকেই মা মনে করে শিশুটি 'মা' 'মা' বলে আঁকড়িয়ে ধরল নিবেদিতাকে। নিবেদিতার চোখের জল আর বাধা মানল না। ঝরঝর করে ঝরে পড়ল শিশুটির গায়ে।

এ যেন শাশ্বত স্নেহময়ী জননীর চিরন্তন অশ্রুধারা!

এগারো

১৮৯৯ সালের ২৮শে মে, রবিবার। কালীঘাটে মায়ের নাট-মন্দিরে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। 'মা কালী' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন নিবেদিতা। কালীঘাটের হালদাররা এই সভার উদ্যোক্তা।

স্বামিজী অসুস্থ, নিবেদিতা একাই এলেন, নগ্নপদে। সভায় প্রচণ্ড ভিড়।

কিছুদিন আগে অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতা 'কালী ও কালীপূজা' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে অনেক বাদপ্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। কেউ নিবেদিতার প্রতি কটূক্তি করেছিলেন, কেউ করেছিলেন তাঁকে সমর্থন। তবু সেই বক্তৃতার ভিতর দিয়ে নিবেদিতা জনসাধারণের কাছে সুপরিচিতা হয়ে উঠলেন। তাই তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য আজ এত ভিড়।

নিবেদিতা বললেন—"হিন্দুর পারিবারিক জীবনে মায়ের প্রভাব সর্বাধিক। মাতাপুত্রের সম্পর্কই সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও নিবিড়। তাই বুঝি অনাদিকাল থেকে সৃষ্টির যিনি মূল কারণ, সেই পরমেশ্বরকে আপনার হতেও আপন করে উপলব্ধি করবার জন্য তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে 'মা'। এর চেয়ে পবিত্রতর ও মধুরতর নাম আর কিছু নেই।

"মাতৃপূজায় অন্যকে উৎসর্গ করার পরিবর্তে আত্মোৎসর্গের বিধান রয়েছে। এই আত্মোৎসর্গই পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য এবং এর মধ্যেই সাধকের শক্তিলাভের সমগ্র রহস্য নিহিত। শক্তির উদ্ভব ত্যাগে।

ত্যাগের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ছাড়া শক্তিপূজার অনুষ্ঠান যথাযথ সম্পন্ন হয় না।"

ভারতের জাতীয়তায় উদ্বোধন রাগিণী নিবেদিতার কণ্ঠে সেদিন এই বক্তৃতার মধ্যে দিয়েই ধ্বনিত হল।

এ দেশের অনেক মানুষ স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্যের নিকৃষ্ট অনুকরণ করছে, এজন্য খুবই মর্মপীড়া অনুভব করতেন নিবেদিতা। তাই পরবর্তী কালে তাঁর অসংখ্য বক্তৃতা ও রচনার মধ্য দিয়ে বারে বারে ভারতবাসীকে আত্মসমাহিত হবার আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। ভারতীয় ভাবের ও আদর্শের এই যে পরম সমন্বয় তাঁর জীবনে ঘটেছিল, তার মূলে ছিল আধ্যাত্মিক জাগরণ।

মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলয়েড তখন বেলুড় মঠের অদূরে বালিতে বাস করছিলেন। নিবেদিতা কিছুদিন ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। মিসেস লেগেটও ছিলেন সেই বাড়িতে। নিবেদিতা লেগেটের শিশুকন্যার জন্য রচনা করলেন 'মা কালী' সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প :

"খুকুমণি, ছেলেবেলার সবচেয়ে আগেকার কোন্ কথাটি তোমার মনে পড়ে বলতো? মায়ের কোলে শুয়ে, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে—সেই কথাটি নয় কি?

মায়ের সঙ্গে খুকুর লুকোচুরি খেলা। মা যেই চোখ বন্ধ করেন, খুকু তাঁর চোখের আড়ালে। আবার তিনি যখন চোখ খোলেন, অমনি দেখতে পান তাঁর খুকুকে। ঈশ্বর এই জননীর মত। তিনিই মা, মহামায়া। তিনি এত বিরাট যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ক্ষুদ্র সন্তান। জগন্মাতা চোখ বন্ধ রেখে তাঁর সন্তানদের সঙ্গে খেলা করেন। আর সারাজীবন ধরে আমরা এই বিশ্বজননীর চোখ খুলে দেবার চেষ্টা করি। যদি কেউ তাঁর চোখ খুলে দিয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতে পারে, তবে সেই মুহূর্তে সে সকল রহস্য জানতে পারে, শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়।

…এই বিশ্বজননীর চোখ যখন বন্ধ থাকে, তখনই আমরা তাঁকে বলি মা কালী।

কিন্তু সত্যই মায়ের চোখ বন্ধ থাকে না। আমাদের চারদিকে নিবিড় অন্ধকার, তাই মনে হয় তিনি চোখ ঢেকে আছেন। কিন্তু যে-মুহূর্তে তুমি কেঁদে উঠবে, মা তখনই তাঁর সুন্দর করুণাভরা দৃষ্টি তোমার দিকে মেলে ধরবেন। আর সেই মুহূর্তে তুমি যদি খেলা বন্ধ করে 'কালী' 'কালী' বলে তাঁর বুকে তোমার ছোট মুখখানি ঢেকে রাখতে পার, তবে তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পাবে।

তুমি কি ক্ষণেকের জন্য খেলা বন্ধ করে, ছোট হাত দুটি জুড়ে তাঁকে ডেকে বলবে না—মা কালী, একবার আমার দিকে তাকাও!"

সহজ কথায় কত সুন্দর এই গল্প!

কত বিচিত্র রূপ এই মহাকালীর! শিশুর কাছে তিনি স্নেহময়ী মা। আবার তিনিই ভীষণ হতেও ভীষণতর!

নিবেদিতা নিজের ভাবে মা কালীর কী অপরূপ রূপই না বর্ণনা করেছেন।

শ্রীমা এলেন একদিন নিবেদিতার স্কুল দেখতে। সঙ্গে এলেন গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি।

নিবেদিতা কী খুশী! গোটা স্কুলবাড়িটা নিবেদিতা ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখালেন।

হঠাৎ একটি ছোট্ট ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন শ্রীমা।

"একি গো! তুমি দেখি ইস্কুলবাড়িতে আবার ঠাকুরঘরও করেছ। ভেবেছিলাম তুমি বুঝি এখনো মেমসাহেবই আছ, কিন্তু এ যে একেবারে অবাক্ করা কাণ্ড!"

সারদাদেবী ভাবে গদগদ হয়ে উঠলেন। ঢুকে পড়লেন ঠাকুর-ঘরের ভেতর।

ঝকঝকে চকচকে ঘর। ধূপধুনার গন্ধে চারদিক মেতে উঠেছে।

গোপালের মা নিবেদিতার চিবুক ধরে আদর করে বললেন—"তুমি আগের জন্মে এ দেশেরই মেয়ে ছিলে গো।"

শ্রীমা ঠাকুরঘরে বসে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন—"আজ খ্রীষ্টানদের কী পর্ব না?"

"হ্যাঁ—ঈস্টার পর্ব।" নিবেদিতা বললেন।

"সত্যি, আজ একটা পবিত্র দিন।" বললেন শ্রীমা।

ঠাকুরঘরের এক কোণে একটি ছোট ফরাসী অর্গান ছিল। নিবেদিতা সেটি টেনে বের করলেন। ডাকলেন কয়েকজন ছাত্রীকে। তাদের নিয়ে নিবেদিতা গাইলেন একটি ঈস্টার উৎসবের গান।

গানের মধুর স্বরে শ্রীমা মুগ্ধ হলেন।

কী সুন্দর অর্গান বাজাতে পারেন নিবেদিতা! কী অপূর্ব তাঁর কণ্ঠস্বর!

দেবতার চরণে নিবেদন করবার মত শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্যই বটে!

২৫শে মার্চ, শনিবার।

'নিবেদিতা' নাম নেবার পর এক বছর পূর্ণ হল। তাই স্বামিজী তাঁকে সেদিন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীরূপে দীক্ষিত করলেন।

পূজার ফুল ও নৈবেদ্য এল। এল পূজার নানা উপকরণ। স্বামিজী বললেন—"মুক্তিই লক্ষ্য নয়, ত্যাগ আত্মোপলব্ধি নয়, আত্মবিসর্জন।"

পূজার পদ্ধতি শিখে নিলেন নিবেদিতা। নিজের হাতে করলেন পূজা। পূজার পর হোম। হোমাগ্নিতে আত্মশুদ্ধি করে গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন নিবেদিতা। স্বামিজী তাঁর ললাটে ভস্মতিলক এঁকে দিলেন।

ভক্ত সাধুরা গেয়ে উঠল সংগীতের সুরে—"হে অগ্নি। হে পাবক,

হে অমৃত, হে বনস্পতি···আমার সব কিছু নাও। আমার বলতে যেন কিছু আর অবশিষ্ট না থাকে।"

নতুন আলোকের অনুভূতি নিয়ে নিবেদিতা সারাদিন বেলুড়ে কাটালেন। হৃদয়ের নিভৃত হতে ঝংকৃত হতে লাগল মন্ত্রের ছন্দ— হরি ওম তৎ সৎ, হরি ওম তৎ সৎ।

এদিকে বিদ্যালয়ের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। সব ছাত্রীরা নিয়মিত আসে না। ঠিক সময়ে না আসার জন্য ক্লাসও ঠিক সময়ে শুরু হতে পারে না। নিবেদিতা লক্ষ্য করলেন, এই অনিয়মের স্বভাবে যেন ওরা অভ্যস্ত। মাত্র এক টাকা মাইনে তাও কোন মেয়ে সময়মত দেয় না।

ক্রমে ক্রমে স্কুলের খরচ চালানো খুবই কষ্টকর হয়ে উঠতে লাগল। অথচ অনেক মেয়ের পরনের কাপড় নিবেদিতাকেই কিনে দিতে হয়। চিকিৎসার খরচও যোগাতে হয় কোন কোন মেয়ের।

নিবেদিতার স্কুলবাড়িটি খুব বড় নয়। তার উপর অস্বাস্থ্যকর। উপরের ঘরগুলি ছোট ছোট, ছাদও নীচু। গরমকালে দুপুরবেলা সেই ঘরগুলি এত গরম হত যে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকলেই মাথা ধরে যেত, পাখার ব্যবস্থাও ছিল না। নিবেদিতা পাখা হাতে ক্লাস করতেন। অসহ্য গরমে তাঁর শুভ্র সুন্দর মুখখানি রক্তিম হয়ে উঠত।

মাঝে মাঝে দুহাতে মাথা চেপে ধরতেন। কেউ তার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন—"ও কিছু না, মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে একটু।"

কিন্তু পরক্ষণেই শিক্ষকতার কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিতেন।

সেবার কলকাতায় গ্রীষ্মের অসহ্য দাপট। শান্তি নেই স্বস্তি নেই মানুষের মনে। স্বামিজীর মন বিষাদ-মগ্ন। মঠের তহবিলে কিছু নেই। শূন্য ভাণ্ডার।

স্বামিজী বললেন নিবেদিতাকে—"টাকা নেই, পাবার আশাও নেই—সব ভেঙে পড়বার আগে তুমি আমাদের সঙ্গ ছেড়ে দাও।"

নিবেদিতার মন ভরে উঠল সন্দেহে ও আশঙ্কায়। বললেন—"আমি কি অযোগ্য?"

হতাশাজড়িত কণ্ঠে স্বামিজী বললেন—"না, আমরাই পারলাম না।"

নিবেদিতা দিলেন আশার আলো। বললেন—"আপনি ভাববেন না কিছু। আমার জমানো কিছু টাকা আছে তাতে কয়েক মাস চলে যাবে।" একটু থেমে বললেন—"তাই বলে বসে থাকলে আমাদের চলবে না। এখানে টাকা পাওয়ার যখন কোন আশা নেই, আমাদের যেতে হবে ভারতের বাইরে।"

স্বামিজীও মনে মনে তাই ভাবছিলেন। শিষ্যার মুখ থেকে সে কথা শুনে নিজেরই যেন প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেলেন নিবেদিতার মধ্যে। প্রসন্ন দৃষ্টি নিয়ে শিষ্যার মুখের দিকে তাকালেন।

নিবেদিতা বললেন—"আমরা হয়তো না পারতে পারি, তা বলে শ্রীরামকৃষ্ণের পরাজয় হতে পারে না কখনো।"

স্বামিজীর মনে যেন একটা বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল। চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন—"এভাবে আমি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে ভাবতে পারি না। আমার উপর তাঁর যে অনেক ভরসা ছিল,—অনেক কিছু আশা ছিল।"

মুহূর্তেই প্রসন্নতায় উজ্জ্বল ও দৃঢ়তায় দৃপ্ত হয়ে উঠল স্বামিজীর মন।

নিবেদিতা বুঝলেন, অর্থসংগ্রহের ভার তাঁকেও নিতে হবে। মিস ম্যাকলয়েড তখন আমেরিকায় গিয়েছেন, নিবেদিতা সব কথা জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেন।

জবাবে ম্যাকলয়েড লিখলেন—"স্বামিজীকে নিয়ে চলে এস।"

স্বামিজী বাইরে যাবার সুযোগ খুঁজছিলেন। চিঠি পাওয়ার পর আশ্বস্ত হলেন। আমেরিকা যাত্রার জন্য তৈরী হতে লাগলেন তিনি।

মে মাসের শেষের দিকে নিবেদিতা স্কুল বন্ধ করে দিলেন। অনেক ছাত্রীর মন খারাপ হয়ে গেল তাতে। তিনি বললেন—"ফিরে এসে আরো বড় স্কুল করব। আরো অনেক ভালো করে চালাব স্কুল।"

ছাত্রীদের নিয়ে নিবেদিতা একদিন জাদুঘরে বেড়াতে গেলেন। শ্রীমার বাড়িতে একটি ঘরে মেয়েদের সেলাইয়ের কাজ, তাদের গড়া নানারকম পুতুল, হাতে আঁকা ছবি ইত্যাদি সুন্দর করে সাজিয়ে তৈরি করলেন একটি ছোটখাটো প্রদর্শনী।

ছাত্রীদের কী আনন্দ! তাদের বাড়ির মা বোনেরা এসে কৌতূহলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলেন।

কিন্তু নিবেদিতা চলে যাবেন এ চিন্তায় অনেকের মনই বিষাদ-ভারাক্রান্ত। অনেকের মুখ মলিন। নিবেদিতা তাদের আদর করেন। মনে আশা দেন, ভরসা দেন। বলেন—"আমি আবার ফিরে আসব। এটা এখন আমারই দেশ। এ দেশ ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি?"

২০শে জুন যাত্রার দিন স্থির হল।

স্বামী তুরীয়ানন্দকেও স্বামিজী সঙ্গে নিতে মনস্থ করলেন। ঠিক হল, প্রথমে তাঁরা লণ্ডনে যাবেন, তারপর যাবেন আমেরিকায়।

যাত্রা শুরু হল। স্বামিজী, নিবেদিতা ও তুরীয়ানন্দ এলেন কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে।

বহু লোকের ভিড়। মঠের সন্ন্যাসী ছাড়াও অনেক লোক এসেছে তাঁদের সংবর্ধনা জানাতে।

'গোলকুণ্ডা' জাহাজ বন্দরে অপেক্ষা করছিল। নিবেদিতা ও তুরীয়ানন্দকে নিয়ে স্বামিজী জাহাজে উঠলেন।

জাহাজ ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখা গেল কেউ রুমাল ঘুরিয়ে কেউ বা হাত নেড়ে তাঁদের বিদায়-অভিনন্দন জানাতে লাগলেন।

২৪শে জুন জাহাজ মাদ্রাজে পৌঁছল। দূর থেকে দেখা গেল বহু লোক সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে আছে। প্লেগ আক্রমণের আশঙ্কায় কোন ভারতীয় যাত্রীকে নামতে দেওয়া হল না। বহু লোক নৌকা করে স্বামিজীকে দেখে গেল ও দিয়ে গেল নানা উপহার।

কলম্বোতে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সেখানে তাঁরা তিনজন তীরে নামলেন। বিরাট জনতা তাঁদের অভিনন্দন জানাল। কলম্বোতে মিসেস হিগিনের বৌদ্ধ বালিকা বিদ্যালয় এবং কাউণ্টেস ক্যালোভারার কনভেণ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন তাঁরা। বিদ্যালয় সম্বন্ধে মিসেস হিগিনের সঙ্গে নিবেদিতার অনেক আলোচনা হল।

মিসেস হিগিন বললেন—"আপনার সাহায্য পেলে আমি এখানে একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি।"

নিবেদিতা আগেই কল্পনা করেছিলেন কলকাতা, মাদ্রাজ এবং পুনায় একটি করে বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। এখন কলম্বোতেও একটি বিদ্যালয় খুলবার সম্ভাবনা দেখা গেল। তাই তিনি বললেন—"আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব।"

জাহাজ ভেসে চলল আবার সাগর অতিক্রম করে। স্বামিজী নিবেদিতাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। বেদ, উপনিষদ, বিজ্ঞান কোন কিছুই বাদ গেল না।

দিলেন উপদেশ—"সাবধান, উত্তম আহার, পরিচ্ছদ, এসবের প্রতি মনোযোগ দিও না। সংসারে বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হলে চলবে না। ওসব একেবারে পরিত্যাগ করা চাই। এ কেবল ভাবুকতা। ইন্দ্রিয়ের অসংযম থেকেই এর উৎপত্তি।"

স্বামিজী এভাবেই নিবেদিতার মন থেকে ভোগের আকাঙ্ক্ষা দূর করে দিয়ে তাঁকে মুক্ত জীবন বরণ করে নেবার প্রেরণা দিলেন।

একদিন নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন বিবেকানন্দকে—"স্বামিজী, জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা কি ?"

বিবেকানন্দ বললেন—"মনুষ্যত্বলাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। একথাই আমি পৃথিবীতে প্রচার করে বেড়াচ্ছি।"

গুরুর মুখে এই জবাব শুনে নিবেদিতা যেন জীবনের দিক্‌চক্রবালে দেখতে পেলেন এক নূতন আলোকরেখা।

আনন্দময় সমুদ্রযাত্রা। স্বামিজী জাহাজে বসেই লিখতে শুরু করলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত'।

কিন্তু শুধু লিখেই মন তৃপ্ত হয় না। স্বামিজী মধুর অথচ গম্ভীর কণ্ঠে পড়ে শোনান—

"হে ভারত ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী,—ভারতবাসী আমার ভাই—ভারতবাসী আমার প্রাণ···বল, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ···"

শুনতে শুনতে নিবেদিতার মন ছুটে যায় ভারতবর্ষের মাটিতে, যে মাটি আজ তাঁর কাছে মহাতীর্থ।

৩১শে জুলাই জাহাজ ইংলণ্ডের টিলবেরী ডকে এসে পৌঁছল। সেখানে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিসেস ফাঙ্কি ও মিস ক্রিস্টিন। স্বামিজীকে দর্শনের জন্য আমেরিকা থেকে তাঁরা এসেছেন ইংলণ্ডে।

ইংলণ্ডের অধিকাংশ বন্ধুই তখন বাইরে। কাজেই স্বামিজী তুরীয়ানন্দকে নিয়ে উইম্বলডনে নিবেদিতার মায়ের বাড়িতেই উঠলেন।

অনেক দিন পর মেয়েকে এবং সেই সঙ্গে স্বামিজীকে দেখতে পেয়ে মেরীর কী আনন্দ! ভাই বোনেরাও খুব খুশী।

নোবল পরিবারের সঙ্গে স্বামিজীর ঘনিষ্ঠতা খুবই বেড়ে উঠল।

নিবেদিতার ছোট ভাই রিচমণ্ড নোবলও স্বামিজীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন। যে দু'জন শিষ্যা আমেরিকা থেকে এসেছিলেন, তাঁরাও এই নোবল পরিবারের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন। এই সময়েই ক্রিস্টিনের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হল এবং সেই সূত্রে হল বন্ধুত্ব।

সেই বন্ধুত্বের টানে ক্রিস্টিন পরবর্তী জীবনে ভারতে এসেছিলেন এবং নিবেদিতার অনেক কাজেই ছিলেন তাঁর সহযোগিনী।

দুই সপ্তাহ ইংলণ্ডে থেকে স্বামিজী তুরীয়ানন্দকে নিয়ে নিউইয়র্ক যাত্রা করলেন।

নিবেদিতা রয়ে গেলেন ইংলণ্ডেই। কয়েকদিন পরেই তাঁর বোন মে-র বিয়ে। সেই বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য মায়ের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না।

যথাসময়ে মে-র বিয়ে হয়ে গেল। মিস ম্যাকলয়েড এই উপলক্ষে নিবেদিতাকে একটি সুন্দর পোশাক পাঠালেন। কিন্তু নিবেদিতা সে পোশাক পরলেন না, সাধারণ সাদাসিধে পোশাক পরেই বিয়ের উৎসবের সময়টা কাটিয়ে দিলেন। তিনি যে স্বামিজীর কাছ থেকে ত্যাগব্রতে দীক্ষা নিয়েছেন।

বিয়ের উৎসব চুকে যেতেই নিবেদিতা নিউইয়র্ক যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছতেই দেখা হল স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে। বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি নিউইয়র্কে অবস্থান করছিলেন। ইতিপূর্বেই তিনি 'হিন্দুসমাজে নারী' শীর্ষক বক্তৃতায় ভারতে নিবেদিতার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বলেছিলেন। তাতে সেখানকার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিবেদিতার নাম এবং তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তাতে ভবিষ্যতে অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে নিবেদিতার সুবিধা হয়েছিল।

স্বামিজী মিঃ ও মিসেস লেগেটের পল্লীভবন 'রিজলি ম্যানর'-এ

বাস করতে লাগলেন। নিউইয়র্ক থেকে দেড়শো মাইল দূরে হাডসন নদীর তীরে পাহাড়ের উপর সেই স্থানটি ছিল স্বাস্থ্যকর এবং অতি মনোরম।

নিবেদিতা ইংলণ্ডের কাজ চুকিয়ে চলে এলেন 'রিজলি ম্যানর'-এ। সেখানে স্বামিজীর সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও কয়েকদিন তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন। এলেন মিসেস স্যারা বুল, তাঁর সঙ্গে কন্যা ওলিয়া। মিসেস লেগেটের বোন মিস ম্যাকলয়েড আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। তাই 'রিজলি ম্যানর' পল্লীভবনে আনন্দের হাট বসল।

আনন্দেই কেটে গেল কয়েকটি দিন। কিন্তু নিবেদিতার তো বসে থাকলে চলবে না। তাঁর মুখ চেয়ে বসে আছে বাংলা দেশের মেয়েরা। তাঁর জন্য সেখানে পড়ে আছে অনেক কাজ—অনেক দায়িত্ব। পাশ্চাত্য থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে তাদের জন্য। 'ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা'—

স্বামিজী 'রিজলি ম্যানর' ছেড়ে চলে গেলেন শিকাগোতে। তার দুদিন পর নিবেদিতাও গেলেন। সঙ্গে মিসেস বুলের কন্যা ওলিয়া।

শিকাগো শহরে গিয়ে প্রথম পরিচয় হল হেল পরিবারের সঙ্গে। মিস মেরী হেলের সঙ্গে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল। মেরী হেলকে স্বামিজী 'বোন' বলে ডাকতেন। নিবেদিতা স্বামিজীর মানসকন্যা, কাজেই মেরী হলেন তাঁর পিসী।

নিবেদিতা বেরিয়ে পড়লেন তাঁর কাজে। অর্থ সংগ্রহ করতে হলে আগে দরকার ভারত সম্বন্ধে প্রচার। তাই নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

প্রথমে একটি স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে দিলেন ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা। যীশুখ্রীষ্ট দিয়ে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ,

ভগিনী নিবেদিতা—



সম্বন্ধে মজার মজার গল্প বললেন। বয়স্ক ছাত্রীদের কাছে বললেন ভারতের গঙ্গানদী, আগ্রার তাজমহল এবং আরও অনেক কিছুর মনোরম কাহিনী। শুনে সবার কী আনন্দ!

পরদিন এক মিশনারী সংস্থা আমন্ত্রণ জানাল নিবেদিতাকে। সেখানে তিনি 'ভারতীয় নারীদের অবস্থা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। কয়েকদিন পরে হাল হাউসে এক সভার আয়োজন হল। নিবেদিতা সেদিন বললেন 'ভারতের ধর্মজীবন' সম্বন্ধে।

কী সুন্দর তাঁর বক্তৃতা দেবার কৌশল! তাই সব জায়গাতেই পেলেন প্রচুর প্রশংসা।

১লা ডিসেম্বর তারিখটি নিবেদিতার মনে রাখবার মত দিন। হাল হাউসে আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফট অ্যাসোসিয়েশন তাঁর এক বক্তৃতার আয়োজন করল। নিবেদিতা বললেন ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা সম্বন্ধে। ঐ বক্তৃতায় তিনি লাভ করলেন পনেরো ডলার। এ যেন দেবতার আশীর্বাদ! নিবেদিতা সানন্দে তা গ্রহণ করলেন।

তাঁর জনপ্রিয়তা দিন দিনই বাড়তে লাগল। বাড়তে লাগল মানুষের কৌতূহল। ভারত সম্বন্ধে কৌতূহলী লোকের ভিড়ও তাই বাড়তে লাগল।

অনেক হিতৈষী বন্ধু লাভ করলেন নিবেদিতা। মিসেস কোহান, মিসেস ইয়ারো, মিসেস কংগার, মিসেস কিং প্রভৃতি মহিলারা এলেন এগিয়ে। দিলেন আর্থিক সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি।

শিকাগো থেকে রওনা হয়ে নানা জায়গা ঘুরে নিবেদিতা গেলেন ডেট্রয়েটে। কোথাও সাহায্য মিলল, কোথাও মিলল না। কিন্তু সেজন্য মোটেই দমে গেলেন না নিবেদিতা।

শিকাগোকে কেন্দ্র করে তিনি বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে ছোট ছোট হিতৈষী দল গড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও পেলেন অনেক বাধা। দল গড়ে আর ভাঙে।

স্বামিজীও তখন আমেরিকার নানা জায়গায় অর্থ সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নিবেদিতা যে নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তা জানতে পেরে মাঝে মাঝেই উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখতেন।

একটি পত্রে স্বামিজী লিখলেন—"আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলেছে—একটা বিরাট বলি ছাড়া অন্য কোন প্রকারে এর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয়, তারা অনেক যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায়। আর যারা বাধা দেয় তাদের দুর্ভোগ অনেক।

"তোমার বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ আসবেই, আসতেই হবে। আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন, কোন্ পথ দিয়ে কাকে নিয়ে যাবেন। তিনি যে পথ দিয়ে নিয়ে যান, সব পথই সমান।···ধৈর্য ধর···ধৈর্য ধর···"

অনেক ধৈর্য ধরার পর, অনেক কষ্ট সহ্য করার পর নিবেদিতা দেখতে পেলেন আশার আলোক। কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু তিনি লাভ করলেন। তাঁদের নিয়ে একটি 'রামকৃষ্ণ সাহায্যমণ্ডলী' গঠন করা হল। 'রামকৃষ্ণ বালিকা-বিদ্যালয় পরিকল্পনা' নাম দিয়ে ভারতবর্ষে কিভাবে কাজ করা হবে তারই সুচিন্তিত কার্যসূচী নিয়ে ছাপান হল একটি পুস্তিকা।

এই বই ছাপার সময়েও খুব অসুবিধায় পড়লেন নিবেদিতা। অনেক টাকার দরকার অথচ হাতে টাকা নেই। মিঃ লেগেট দিলেন এক হাজার ডলার। নিবেদিতা নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে নামলেন। মিসেস লেগেট হলেন সেই মণ্ডলীর সাধারণ অধ্যক্ষা এবং মিসেস বুল হলেন সম্পাদিকা।

শিকাগো, নিউইয়র্ক, বোস্টন, কেম্ব্রিজ ও ডেট্রয়েটেও এর কেন্দ্র গড়ে উঠল। বিভিন্ন লোকের উপর দেওয়া হল সেগুলোর পরিচালনার

ভার। প্রতি কেন্দ্রের জন্য একজন করে সম্পাদিকা নিযুক্ত হলেন। ক্রিস্টিন হলেন ডেট্রয়েট কেন্দ্রের সম্পাদিকা।

স্থির হল, সংগৃহীত অর্থ নিউইয়র্কের এক প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হবে। যাঁরা অর্থসাহায্য করবেন তাঁদের নাম নিবেদিতার কাছে পাঠালে তিনি রসিদ এবং কার্যবিবরণী পাঠাবেন।

১৯০০ সালের মে মাসে নিবেদিতা গেলেন জ্যামাইকা শহরে। সেখানে তখন মেয়েমহলেও ছড়িয়ে পড়েছে নিবেদিতার নাম। কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা একটি সভার আয়োজন করলেন। নিবেদিতা ভাষণ দিতে গিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—যদি কোন দেশ বিশ্ববাসীকে যথার্থ সত্যের সন্ধান দিতে পারে, সে দেশ ভারতবর্ষ।

বারো

প্যারিসে এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে।

এর অন্যতম আকর্ষণ বিজ্ঞান-বিভাগ। তা ছাড়াও সেই উপলক্ষে হবে আন্তর্জাতিক ধর্মমহাসভার উৎসব।

সম্মেলনের পক্ষ থেকে স্বামিজীকে আমন্ত্রণ জানানো হল। মিঃ ও মিসেস লেগেট প্রদর্শনী উপলক্ষে প্যারিস যাত্রা করলেন। কিছুদিন পরে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলয়েড'ও চলে গেলেন।

স্বামিজী তখন নিউইয়র্কে। নিবেদিতাও এর মধ্যে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন। দুজনেই বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। নিউইয়র্কে স্থায়ী বেদান্ত-সমিতি গড়ে উঠেছে। নিবেদিতার প্রচারকার্য সেখানেই সার্থকতার রূপ নিয়েছে সবচেয়ে বেশী।

নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল নিউইয়র্কে আরও কিছুদিন থাকবেন। কিন্তু ওদিকে অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজ প্যারিস থেকে ডাক দিয়েছেন নিবেদিতাকে।

প্যাট্রিক গেডিজ জীবনতত্ত্ববিশারদ, বিজ্ঞানী। প্যারিস প্রদর্শনীতে আন্তর্জাতিক সংসদের ছিল এক বিশেষ ভূমিকা। সেই সংসদের কার্য পরিচালনার ভার ছিল অধ্যাপক গেডিজের উপরে। নিউইয়র্কে গেডিজের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়। তখনই নিবেদিতার প্রতিভায় ও কর্মশক্তিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাই তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্য ডেকে পাঠালেন নিবেদিতাকে।

২৮শে জুন নিবেদিতা প্যারিস যাত্রা করলেন।

প্যারিসে তাঁর কাজ হল অধ্যাপক গেডিজকে সাহায্য করা। কিন্তু কাজে নেমে দেখা গেল বাধা অনেক। নিবেদিতার সৃষ্টিধর্মী মন ধরাবাঁধা কাজের মধ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠত। তবু আপ্রাণ চেষ্টা করতেন যাতে ব্যর্থতার অপবাদ না নিতে হয়।

কিছুদিন পরেই এসে গেলেন স্বামিজী। নিবেদিতা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আগস্ট মাসে প্যারিসে বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য ভারত থেকে এলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত্রী। নিবেদিতার কাছে এতে প্রদর্শনীর আকর্ষণ যেন অনেক বেড়ে গেল।

অনিবার্যভাবেই গেডিজের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মধুর সম্পর্ক এবং বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। নিবেদিতার সঙ্গেও হল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। প্যারিস বিজ্ঞান কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিচয় দিয়ে প্রশংসা অর্জন করলেন।

তাতে আনন্দে ও গর্বে নিবেদিতার অন্তর ভরে উঠল।

প্যারিসে স্বামিজী লেগেট দম্পতির গৃহে ছিলেন। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও দার্শনিক জুল বোয়ারের গৃহেও আতিথ্যগ্রহণ করলেন। লেগেট দম্পতির মনোরম বিরাট বাসভবন গুণিগণের সমাবেশে মুখরিত থাকত। শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে স্বামিজী খুশী হতেন।

নিবেদিতা মাঝে মাঝে যেতেন সেই বাড়িতে। স্বামিজীর সঙ্গে দেখা হত। কিন্তু নিবেদিতার প্রতি তাঁর কেমন যেন উদাস ভাব। ভাল করে কথা বলেন না নিবেদিতার সঙ্গে—ভবিষ্যৎ কার্যাবলী সম্বন্ধেও কোন আলোচনা করেন না।

স্বামিজীর এই উদাসীন ভাব নিবেদিতার মনকে ব্যথিত করে তুলল।

আন্তর্জাতিক ধর্মমহাসভার কাজ ভাল ভাবে বুঝবার জন্য স্বামিজী

ফরাসী ভাষার চর্চা শুরু করলেন। ফ্রান্সের উদারতার স্পর্শ তাঁর হৃদয়কে অনুরাগে রাঙিয়ে তুলল। বিখ্যাত ফরাসী গায়িকা এমার গান শুনে মুগ্ধ হলেন তিনি। তাঁর গান শুনবার জন্য থিয়েটারও দেখলেন কয়েকদিন। শিখে নিলেন তাঁর কাছ থেকে 'লা মার্সেইল্যাজ' রণসংগীত।

ব্যাকুল হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। স্বামিজীর মানসিক পরিবর্তন ঘটছে কি! কিন্তু কেন?

মুখ ফুটে কিছু বলবার উপায় নেই। মিস ম্যাকলয়েড তখন স্বামিজীর সঙ্গিনী। তাঁকেই নিবেদিতা জানালেন সব কথা। স্বামিজী ম্যাকলয়েডকে বললেন—"আমি এখন স্বাধীন, এ সব কিছু যা করছি স্বাধীন হয়ে করছি। আমি আবার ফিরে গেছি আমার শৈশবে।"

স্বামিজীর দেহ মন শ্রান্ত, তিনি যেন মুক্তি চান। স্বদেশে ফেরবার জন্য মন তাঁর ব্যাকুল। স্থির করেছেন প্রদর্শনী শেষ হলেই ভারতে ফিরে যাবেন।

নিবেদিতার অন্তর্বেদনা মিসেস বুলকে বিচলিত করল। তিনি স্বামিজীকে অনুরোধ করলেন ব্রিটানীতে সমুদ্রতীরে তাঁর কাছে কয়েকদিন কাটিয়ে যাবার জন্য। স্বামিজী গেলেন। গেলেন নিবেদিতাও। পেলেন কিছুদিনের জন্য গুরুর সান্নিধ্য।

কিন্তু তাতেও যেন মনের মেঘ কাটল না। গুরুদেব কি চান আমার কাছে? তিনি কি ধারণা করেছেন আমি ইওরোপের নানা কাজে জড়িত হয়ে ভারত থেকে দূরে সরে যাচ্ছি?

নিবেদিতা এবার কর্মপন্থা স্থির করে ফেললেন। ইংলণ্ডে যাবেন অর্থসংগ্রহের জন্য। একাই যাবেন।

তাঁর যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যার পর লতায় ফুলে ঢাকা একটি

কুটীরের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালেন স্বামিজী। তিনি এসেছেন নিবেদিতাকে আশীর্বাদ জানাতে। নিবেদিতা তা বুঝলেন। ধীরে ধীরে তিনি বাগানের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। মুখে একটি কথাও বললেন না।

স্বামিজী বললেন—"যাও, কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দাও। যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি, বিনষ্ট হও। আর যদি মহামায়া তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, সার্থক হও।"

নীরবে অবনতমস্তকে নিবেদিতা সে আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন।

পরদিন সকালে যাত্রা শুরু। সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, স্বামিজী আবার এলেন নিবেদিতাকে বিদায় দিতে।

ব্রিটানীতে যানবাহনের অভাব। কৃষকের পণ্যবাহী এক গাড়িতে উঠে বসলেন নিবেদিতা। স্বামিজী কুটীরের বাইরে পথের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন।

গাড়ি ছেড়ে দিল। বারবার পিছনে ফিরে তাকালেন নিবেদিতা। প্রভাত সূর্যের ঝলমল আলোর মাঝে স্বামিজী দাঁড়িয়ে আছেন। দু হাত উপরে তোলা। প্রাণভরে আশীর্বাদ করছেন।

অক্টোবরের শেষে এক আলো-আঁধারি সন্ধ্যায় নিবেদিতা এসে পৌঁছলেন লণ্ডনে। যে জাহাজে তিনি এলেন সে জাহাজে সঙ্গী পেলেন আচার্য বসু ও তাঁর পত্নীকে। তাঁদের সঙ্গ নিবেদিতার নিঃসঙ্গ মনকে মুখর করে তুলল।

লণ্ডনে এসেই নিবেদিতা কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দিনের তালিকা ভরে উঠল কাজের চাপে। বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে কিছু কিছু আশ্বাসও পেলেন।

ওদিকে আচার্য বসু নিবেদিতার আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তিনি নিবেদিতার গুণে মুগ্ধ। বিদেশ-ভ্রমণের নানা কাজে

সহযোগিতা চাইলেন তাঁর কাছ থেকে। নিবেদিতা সানন্দে রাজী হলেন।

উৎসাহের সঙ্গে নিবেদিতা আচার্য বসুকে সাহায্য করতে লাগলেন। রয়েল সোসাইটির মূল্যবান্ কাগজপত্র গুছিয়ে রাখেন নিজের হাতে। দরকারী তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। রয়েল সোসাইটির আগামী সভায় আচার্য বসুকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। সে ব্যাপারে নিবেদিতাই হয়ে উঠলেন তাঁর একমাত্র আশা-ভরসা।

কিন্তু রয়েল সোসাইটিতে যাওয়ার আগেই আচার্য বসু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিবেদিতাই নিলেন তাঁর চিকিৎসা ও সেবাযত্নের ভার। তাঁদের উইম্বলডনের বাড়িতে আচার্য বসুকে রাখবার ব্যবস্থা করলেন।

আচার্য বসুর অপারেশন হবে। দিনও ধার্য হয়ে গেল। অপারেশনের পর তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। নিবেদিতার দুশ্চিন্তা গেল বেড়ে। আহার-নিদ্রা ভুলে তিনি রোগীর সেবা করতে লাগলেন।

আচার্য বসুর পত্নী অবলা বসু মুগ্ধ হয়ে যান এই বিদেশী নারীর আন্তরিকতায়, অকুণ্ঠ সেবাযত্নের মহিমায়। নিবেদিতাই আচার্য বসুর সব দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছেন। তিনি তাঁর পাশে পাশে থেকে সাহায্য করছেন মাত্র।

নিবেদিতাকে দেখে মনে হয় তিনি যেন সেবাব্রতের এক নীরব প্রাণময়ী প্রতিমা! আচার্য বসুকে সেবা করার ভিতর দিয়ে নিবেদিতা যেন খুঁজে পান তাঁর আদর্শকে। যেই জীব সেই শিব। মানুষের ভিতর পান তিনি শিবের সন্ধান।

আচার্য জগদীশ বসু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তবু নিবেদিতার সতর্ক-স্নেহ দৃষ্টি তাঁর উপর। বাইরে যাওয়া জগদীশচন্দ্রের বন্ধ। দুজনে মিলে পড়াশোনা ও আলোচনা নিয়ে সময় কাটান। ব্রাহ্মধর্মের কথা ওঠে। নিবেদিতা প্রশ্ন করেন, আচার্য বসু তার জবাব দেন। এমনি করে নিবেদিতা সংগ্রহ করেন এই ধর্মের তথ্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো সর্বধর্মের সমন্বয়। ব্রাহ্মধর্মের নিরাকার বোধের মধ্য দিয়ে সাকার পূজার বিষয় আরও স্পষ্ট আলোকিত হয়ে উঠল নিবেদিতার অন্তরে। আত্মবোধের দিক্ দিয়ে যেন তিনি পরিপূর্ণা হয়ে উঠলেন।

এত সব কাজের মধ্যেও নিবেদিতার দৃষ্টি ছিল ভারতের দিকে। টাকার জন্য নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। লিখতেও লাগলেন প্রচুর। একটি বড় প্রকাশক প্রতিষ্ঠান তাঁদের পত্রিকার জন্য নিবেদিতাকে নিয়মিতভাবে লেখা পাঠাবার অনুরোধ করলেন। সম্মান-দক্ষিণারও দিলেন প্রতিশ্রুতি।

এদিকে শ্রীমার কাছ থেকে ডাক এল ভারতে ফিরে আসার জন্য। স্বামী সারদানন্দ পত্র লিখলেন শ্রীমা অসুস্থ। মিস ম্যাকলয়েডের ইচ্ছা নিবেদিতা ভারতবর্ষে ফিরে আসুন।

চঞ্চল হয়ে উঠল নিবেদিতার মন। কিন্তু এদিকে কাজ রয়েছে অনেক। আরও টাকা তুলতে হবে স্কুলের জন্য।

আমন্ত্রণ পেয়ে নিবেদিতা স্কটল্যাণ্ডে গেলেন। এডিনবরায় ভিক্টোরিয়া ক্লাবে বক্তৃতা দিলেন। বিষয় হল—'ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ'। আর একদিন বক্তৃতা দিলেন 'ভারত' সম্বন্ধে। বেশ সাড়া পাওয়া গেল।

স্কটল্যাণ্ড থেকে ফিরে দেখা হল রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে। পরিচয় হল। ভারতীয় মনীষীর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে নিবেদিতা মুগ্ধ হলেন। কোন বিশেষ কাজে রমেশচন্দ্র এসেছিলেন লণ্ডনে। সে কাজ রমেশচন্দ্রের নিজস্ব নয়—ভারতেরই কাজ। রমেশচন্দ্র নিবেদিতার সাহায্য চাইলেন। নিবেদিতা সানন্দে রাজী হলেন তাঁকে সাহায্য করতে।

নিবেদিতা ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে আত্মচেতনা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। লেখা এবং বক্তৃতা দুই-ই চলতে লাগল।

ওদিকে ভারতে ফেরবার জন্যও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। রমেশচন্দ্র চিঠি লিখলেন বিবেকানন্দকে—"ভারতের কাজের জন্যই নিবেদিতার আরও কিছুদিন লণ্ডনে থাকা প্রয়োজন।"

তিন চার মাস নিবেদিতার কাটল চলন্ত কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে। ওদিকে ফিরবেন বলে শ্রীমাকে তিনি চিঠি দিয়েছেন, অথচ দিন স্থির করতে পারছেন না। মন অস্থির, শরীর ক্লান্ত। কিছুদিন বিশ্রাম প্রয়োজন।

ঠিক সেই সময়ে নিবেদিতা পেলেন মিসেস বুলের আহ্বান। নরওয়ের বার্গেন শহরে তাঁর পরলোকগত স্বামী ওলিবুলের মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে, সেই উপলক্ষে নিবেদিতাকে নিমন্ত্রণ জানালেন। নিবেদিতা গেলেন।

কী সুন্দর জায়গা। নিবেদিতার খুব ভাল লাগল। নিজে কিছুদিন নির্জনে বাস করবার জন্য সমুদ্রের এক খাড়ির ধারে গুহার মত একটি জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে কুটীরের মত তৈরি করলেন। মিসেস বুল যে ক'দিন ছিলেন, মাঝে মাঝে যেতেন নিবেদিতার সেই কুটীরে।

সমুদ্রের তীরে সবুজ বন, পাথরের ছোট ছোট স্তূপ, লম্বা গাছের সারি। এক মনোরম পরিবেশ।

অনেকেই আসতেন নিবেদিতার সেই অরণ্য নিবাসে। আচার্য জগদীশ বসু সস্ত্রীক এসে কিছুদিন কাটিয়ে গেলেন। মিসেস সোভিয়ার এসেছিলেন লণ্ডনে। তিনি দেশে ফেরবার পথে নরওয়ে হয়ে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। এলেন ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের মিঃ জন ল্যাণ্ড। এলেন রমেশচন্দ্র দত্ত।

নিবেদিতা সেখানে বসেই লিখছিলেন—The Web of Indian Life. রমেশচন্দ্রকে পেয়ে তাঁর খুব সুবিধা হল। লেখেন আর পড়ে শোনান। দরকার হলে আলোচনা করে একটু অদল বদল করেন।

নির্জন অরণ্যবাসে নিবেদিতার শরীর ও মন অনেকটা সুস্থ হল। কিন্তু একটি দিনের জন্যও তিনি ভারতের কথা বিস্মৃত হলেন না। স্থির করলেন এবার আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ভারতে ফিরে যাবেন।

তিন মাস নরওয়েতে বাস করে নিবেদিতা ফিরে এলেন লণ্ডনে। নতুন উদ্যমে কাজে নেমে পড়লেন। বক্তৃতা ও লেখা সমান তালে চলতে লাগল।

এই সময়েই নিবেদিতা আচার্য বসুর Living and Non-Living নামক বইটির সম্পাদনা করলেন।

এবার ফেরার পালা।

মিস ম্যাকলয়েড তখন জাপানে। কথা ছিল নিবেদিতাও সেখানে যাবেন কিন্তু আর দেরি সহ্য হল না। ৩১শে ডিসেম্বর নিবেদিতা মম্বাসা জাহাজে জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন। তারপর প্যারিস হয়ে ৯ই জানুয়ারি (১৯০১) উঠলেন ঐ জাহাজে গিয়ে।

এবার সঙ্গে আছেন রমেশচন্দ্র দত্ত ও মিসেস বুল।

তেরো

৩রা ফেব্রুয়ারি মম্বাসা জাহাজ মাদ্রাজে নঙ্গর ফেলল।

মাদ্রাজবাসীর কাছে 'নিবেদিতা' এখন একটি পরিচিত নাম। সেখানকার মহাজন-সভা হলে রমেশ দত্ত ও নিবেদিতাকে সম্বর্ধনা জানানো হল। মিঃ জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার অভিনন্দন-পত্র পাঠ করলেন।

রমেশচন্দ্র তাঁর ভাষণে নিবেদিতার উল্লেখ করে বললেন—"ভারতবর্ষের সেবায় যে নারী জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁকে সংবর্ধনা করেছেন দেখে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠছে।"

নিবেদিতা বললেন—"ভারতকে আমি ভালবাসি, তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আমি শ্রদ্ধা করি। ভারতকে যারা বর্বর দেশরূপে অভিহিত করে তাদের আমি ঘৃণা করি।"

আবার সেই বাগবাজার পল্লী। বোসপাড়া লেনের বাড়ি। এবার থেকে ১৭নং বাড়িতেই নিবেদিতার আস্তানা।

স্বামিজী তখন অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন কাশীতে। তবু মিসেস বুলকে পত্র লিখলেন—'প্রিয় মাতা ও কন্যাকে আর একবার ভারত-ভূমিতে স্বাগত জানাচ্ছি।'...

নিবেদিতা আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মসাগরে। তাঁর যে অনেক কাজ। বিদেশ থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন, তা দিয়ে গড়ে তুলবেন স্কুলবাড়ি। অনেক মেয়ে তাতে পড়াশোনা করতে

পারবে। তাতে থাকবে খেলাধুলার ব্যবস্থা—থাকবে তাদের প্রতিভা বিকাশের নানা সুযোগ। স্বামিজীর স্বপ্নকে এমনিভাবে সফল করে তুলবেন নিবেদিতা।

নতুন বাড়ি তৈরি করার কাজ শুরু হল।

প্রতিটি ইটের মধ্যে গাঁথা হয়ে রইল নিবেদিতার প্রাণের স্বাক্ষর। তৈরী হতে লাগল স্বামিজীর স্বপ্নসৌধ।

নিবেদিতা ভাবতে থাকেন কবে স্বামিজী আসবেন, কবে স্কুল বাড়ি তৈরি শেষ হবে। কবে নিজের হাতে স্বামিজী উদ্বোধন করবেন নতুন ভবন।

১১ই মার্চ, ১৯০২—শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি। স্বামিজী তাঁর কয়েকদিন আগেই কাশী থেকে ফিরে এলেন।

হঠাৎ একদিন দু'জন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে স্বামিজী হাজির হলেন বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে। নিবেদিতার কী আনন্দ! উল্লাসে তিনি বলে উঠলেন—"জয়, জয় গুরু!"

গুরুকে যথারীতি অভ্যর্থনা করে বসালেন মৃগচর্মাসনে। পায়ের ধূলি মাথায় নিয়ে শুধালেন—"কেমন আছেন?"

কিন্তু স্বামিজীর শরীরের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন নিবেদিতা—"একি! আপনার শরীরের এ কী অবস্থা!"

স্বামিজী মধুর মৃদু হাসি হেসে বললেন—"গীতায় তো পড়েছ, আত্মা অবিনশ্বর কিন্তু শরীরটা ক্ষয়শীল।"

আটত্রিশ বছরের আয়ু নিয়ে তিনি যেন শেষের প্রতীক্ষায় রয়েছেন, এই কথায় সেই ব্যথার সুরটিই যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল।

নিবেদিতা বললেন—"নতুন বাড়িতে স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় আপনি এসে আশীর্বাদ করবেন তো?"

কাঁধে হাত রেখে স্বামিজী বললেন—"আমার আশীর্বাদ তো সব সময়েই রয়েছে তোমার উপর।"

এপ্রিলের প্রথমেই ভারতে এসে পৌছলেন স্বামিজী-শিষ্যা মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল। আমেরিকা প্রবাসী এই জার্মান মহিলাই পরে পরিচিতা হন ভগিনী ক্রিস্টিন নামে।

মিস ম্যাকলয়েডও জাপান থেকে এসে গেছেন। সঙ্গে দুই জাপানী বন্ধু, প্রিন্স ওডা আর কাকুসো ওকাকুরা। জাপানে ধর্মসভার আয়োজন হচ্ছে, তাই তাঁরা এসেছেন স্বামিজীকে আমন্ত্রণ করতে। নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে গিয়ে স্বামিজী সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু জাপান যাওয়া হয়ে উঠল না তাঁর। সেই দলটির সঙ্গে বেড়াতে গেলেন বুদ্ধগয়ায়। সেখান থেকে অসুস্থ হয়ে বেলুড়ে ফিরে এলেন।

ওকাকুরা শিল্পী, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তার উপর সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এক অখণ্ড ভাবগত ঐক্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্। এসব কারণেই নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর মনের সংযোগ ঘটল। ওকাকুরা এই সময়ে 'Ideal of the East' নামক পুস্তকটি লিখছিলেন। নিবেদিতা তার ভূমিকা লিখে দিলেন এবং করলেন সমগ্র বইটির সম্পাদনা।

এদিকে কলকাতায় শুরু হল প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাণ্ডব। নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন স্থির করলেন, কয়েকটি দিন মায়াবতীতে কাটিয়ে আসবেন। স্বামিজীও মত দিলেন। মায়াবতী কেন্দ্র পাশ্চাত্য শিষ্যদের অতি প্রিয় জায়গা। সেভিয়ার দম্পতি সেখানেই বাস করছেন।

নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের সঙ্গী হলেন ওকাকুরা।

পরম রমণীয় স্থান মায়াবতী। সরল বৃক্ষের সারি, রডোডেনড্রন

ফুলের গুচ্ছ, সাদা বন্য গোলাপ আর নানা জাতীয় ফার। মায়াবতী সবার চোখে যেন স্বপ্নের জাল ছড়িয়ে দিল।

কয়েকদিন আনন্দে কাটিয়ে ওকাকুরা চলে গেলেন। ক্রিস্টিনের ইচ্ছা হল আরও কিছুদিন থাকবেন সেখানে। কিন্তু নিবেদিতার তো বসে থাকলে চলবে না। তিনি একাই ফিরে এলেন কলকাতায়।

২৮শে জুন, স্বামিজী এলেন নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে। বোসপাড়ার ১৭নং বাড়ি তাঁর চরণস্পর্শে ধন্য হল। তখন কে জানত, এই হবে সেই বাড়িতে স্বামিজীর শেষ পদার্পণ।

নিবেদিতার মন কেন যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। চারদিন পার হতে না হতেই চললেন বেলুড় মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে।

স্বামিজী বললেন—"আমি মৃত্যুর জন্য তৈরী হচ্ছি। একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করছে।"

কথা শুনে চমকে উঠলেন নিবেদিতা। অমরনাথের কথা মনে পড়ল। স্বামিজী বলেছিলেন—'আমি দেবতার কাছ থেকে ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করেছি।'

বুক কেঁপে উঠল নিবেদিতার।

সেদিন তিনি আর স্বামিজীর সঙ্গ ছাড়া হতে চান না। কথার পর কথা তোলেন। করেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এমনি করে বেলা বেড়ে যায়।

স্বামিজী বল্লেন—"নিবেদিতা, আজ তুমি খেয়ে যাবে এখানে। আমি নিজ হাতে তোমাকে খাওয়াব।"

গুরুর বাক্য অবহেলা করা চলে না। তাই নিবেদিতা খেতে বসলেন। খাবারের জিনিসের মধ্যে কাঁঠালের বিচি সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, ভাত আর বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা দুধ। খাওয়া শেষে হাত ধোবার

সময় স্বামিজী নিজেই নিবেদিতার হাতে জল ঢেলে দিতে লাগলেন। তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলেন হাত।

নিবেদিতা অবাক্। লজ্জিত। বললেন—"স্বামিজী, এসব আমারই আপনার জন্য করা উচিত, আপনার নয়।"

স্বামিজী স্মিত শান্ত হাসি হেসে বললেন—"যীশু তো তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।"

নিবেদিতা চমকে উঠলেন। বলতে চাইলেন—"কিন্তু সে তো শেষ সময়ে···"—হঠাৎ তাঁর মুখে কথাটা আটকে গেল। অব্যক্ত বেদনায় যেন কণ্ঠ রোধ হয়ে এল।

তিন ঘণ্টা স্বামিজীর কাছে কাটিয়ে নিবেদিতা ফিরে এলেন বাড়িতে।

কিন্তু মন চিন্তাভারাক্রান্ত। কোন কাজই সেদিন তাঁর ভাল লাগল না। এত আদর করলেন স্বামিজী—এমন করে সান্নিধ্য পেলেন তাঁর—তবু কোথায় যেন একটা বিচ্ছেদের সুর!

৪ঠা জুলাই, ভোরবেলা বেলুড় মঠ থেকে এক সাধু এলেন নিবেদিতার বাড়িতে। তাঁর হাতে একখানা রুটি।

নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন—"এ কি?"

সাধু বললেন—"স্বামিজী পাঠিয়েছেন আপনার জন্য। তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন।"

"কেমন আছেন তিনি?"

"ভালোই। আজ বেশ সুস্থ বোধ করছেন।"

নিবেদিতা মাথায় ছুঁইয়ে ভক্তিসহকারে গ্রহণ করলেন গুরুর প্রসাদ। সেদিন কী আনন্দ নিবেদিতার। নানা কল্পনায় অনুভব করতে লাগলেন গুরুর সান্নিধ্য। গুরু যেন রয়েছেন তাঁর মনের মধ্যে, গুরু যেন রয়েছেন তাঁর চারদিক ঘিরে।



নিবেদিতা, ধীরা মাতা, মিস ক্রিস্টিন ও অবলা বসু

কী অপূর্ব অনুভূতি !

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন নিবেদিতা। এক আশ্চর্য স্বপ্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন শুয়ে আছেন বিছানায়। তাঁর চারদিকে অগণিত ভক্ত। দেহত্যাগ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ভক্তরা হাহাকার করে উঠল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল নিবেদিতার।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন।

এ কী স্বপ্ন !

পূর্ব গগনে তখন প্রত্যুষের আলোরেখা দেখা দিয়েছে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন স্তব্ধভাবে।

এমন সময় দরজায় শুনতে পেলেন করাঘাতের শব্দ। দরজা খুলে দেখলেন একজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একখানা চিঠি।

চিঠি পড়ে নিবেদিতা নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। কাল রাত্রে চিরনিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছেন স্বামিজী।

এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত। নিবেদিতা কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলেন না। বহু কষ্টে মনকে স্থির করলেন। তখনই পত্রবাহকের সঙ্গে চললেন বেলুড়ে।

মঠে এসে দেখলেন, স্বামিজীর দেহ মেঝের উপর শায়িত অবস্থায় রয়েছে। চেহারার কোন পরিবর্তন হয় নি। শান্ত হয়ে যেন নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। ধ্যানমগ্ন মহাদেব !

বসে পড়লেন স্বামিজীর চিরনিদ্রিত দেহের পাশে। হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন।

স্বামিজীর মহাধ্যানমগ্ন মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন

নিবেদিতা। মনে পড়ল সেই অমরনাথের কথা…'আমি ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছি।'……এই কি তবে সেই ইচ্ছামৃত্যু !……

সারা অন্তর তোলপাড় করে বেদনার স্মৃতি মথিত হতে লাগল। কিন্তু নিবেদিতা নির্বিকার। বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। বেলা দুটো পর্যন্ত একভাবে বসে বাতাস করলেন।

তারপর স্বামিজীর দেহ নীচে নামিয়ে আনা হল।

গঙ্গাতীরে সাজানো হল চিতাশয্যা।

চিতা জ্বলে উঠল। প্রথমে অগ্নিসংযোগ করলেন নিবেদিতা, তারপর অন্যান্য সাধুরা। অদূরে একটি গাছের তলায় বসে নিবেদিতা জ্বলন্ত আগুনের ধূমরাশির দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

ধীরে ধীরে চিতার আগুন নিবে এল। গুরুর ভস্মরাশি কুড়িয়ে নিয়ে নিবেদিতা রওনা হলেন বাড়ির দিকে। তখন চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে গোধূলির অন্ধকার।

চোদ্দ

স্বামিজীর তিরোধান নিবেদিতার জীবনে নিয়ে এল এক বিরাট পরিবর্তন।

বেলুড় মঠের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসতে লাগল। মঠের কর্তৃপক্ষ নানা কারণে নিবেদিতার উপর সন্দিহান হয়ে উঠতে লাগলেন।

সত্যই নিবেদিতার জীবন তখন ধেয়ে চলেছে অন্য প্রবাহপথে।

আইরিশ কন্যা নিবেদিতা! ধমনীতে তাঁর বিদ্রোহীর রক্তপ্রবাহ। ধর্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে জেগেছে রাজনৈতিক চেতনা। সেই সুপ্ত চেতনা রূপ পেয়েছে স্বামিজীর পরিকল্পনার মধ্যে···দেশসেবা ও সমাজসেবার মধ্যে!

নিবেদিতা জানেন, গুরু তাঁকে ভারতমাতার বেদীতলেই সমর্পণ করেছেন। কোন মিশনের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকতে পারেন না।

স্বামিজী যে নিজের হাতে এই আশীর্বাণী লিখে উপহার দিয়ে তাঁকে প্রেরণা দিয়ে গেছেন—

মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা,
মলয় সমীরে যথা স্নিগ্ধ মধুরতা,
যে পবিত্র-কান্তি বীর্য, আর্য-বেদীতলে,
নিত্য রাজে, বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে ;
এ সব তোমার হোক—আরও হোক শত
অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্নাতীত ;
ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে।

গুরুর এই আশীর্বাদকে সার্থক করে তুলতে হবে, এই হল নিবেদিতার পণ।

বোসপাড়া লেনের বাড়িটি শুধু বিদ্যালয়ের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল না। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে রেখে গেল তার অমর স্বাক্ষর। ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত মনীষী ও দেশসেবক নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঐ বাড়িতে আসা যাওয়া করতে লাগলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখেল, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু, প্রফুল্লচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি অনেক মনীষীর স্মৃতি জড়িত হয়ে রইল এই বাড়িটির সঙ্গে।

নিবেদিতার গুণমুগ্ধ অনেক বিশিষ্ট ইংরেজ ও মার্কিন বন্ধু-বান্ধবী এখানে আসতেন। বড়লাট-পত্নী লেডি মিণ্টোও একদিন এসেছিলেন। নিবেদিতা এ বাড়িতে বসেই সমগ্র ভারতের প্রাণস্পন্দন অনুভব করতেন।

অন্তর থেকে শোক মুছে ফেলে আবার কাজে নেমে পড়লেন নিবেদিতা। কিন্তু কাজে নেমেই দেখলেন কী কঠোর জীবন তাঁর সম্মুখে। বাড়িভাড়া, লোকজন রাখবার খরচ, নিজের আহার,

বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহ—সব কিছুর জন্যই এখন তাঁকে একাই চেষ্টা করতে হবে। অথচ অর্থাগমের কোন পথ নেই।

অনেক ভেবে চিন্তে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে নিবেদিতা বেরিয়ে পড়লেন ভারত পর্যটনে।

"আমার কাজ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা। আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্তও নয়, আমার উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগানো।"

বোম্বাই শহরে তিন দিন বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। বিষয়বস্তু হল—'স্বামী বিবেকানন্দ', 'এশিয়ার জীবন' ও 'আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দুমন'। বক্তৃতায় বিপুল সাড়া পাওয়া গেল।

১লা অক্টোবর হিন্দু ইউনিয়নের সদস্যরা নিবেদিতাকে একটি চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করলেন। উদ্দেশ্য হল তাঁদের পরিবারের মহিলারা যাতে নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনবার সুযোগ লাভ করে। তার পরদিনই হিন্দু লেডিজ সোশ্যাল ক্লাবের উদ্যোগে আর একটি সভা হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলা।

কয়েকজন প্রশ্ন করলেন নিবেদিতাকে—"আপনি নিজের ধর্ম ছাড়লেন কেন?"

নিবেদিতা বললেন—"আঠারো বছর বয়সে খ্রীস্টান ধর্মের মতবাদ সম্পর্কে আমার মনে গভীর সংশয় জাগল। এই সময়ে পেলাম স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ। জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমার সকল দ্বন্দ্বের অবসান হল।"

"আপনি ভারতকে কেন এত ভালবাসেন?"

"আমি ভারতকে ভালবাসি, কারণ জগতের ধর্মমতগুলির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ভারত তার জন্মদাত্রী।"

সমগ্র বোম্বাই শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিবেদিতার সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হলেন। সেখানে কিছু অর্থও সংগ্রহ হল।

বোম্বাই থেকে নিবেদিতা গেলেন নাগপুর, ওয়ার্ধা ও অমরাবতী। তারপর এলেন বরোদায়।

শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদায় অধ্যাপনা করছেন। নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' বই পড়ে তিনি আগেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য নিজেই গিয়ে স্টেশনে হাজির হলেন। বরোদার মহারাজা ও মহারানীর কাছ থেকে নিবেদিতা পেলেন সাদর সংবর্ধনা।

অরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় হল নিবেদিতার। এ পরিচয় লৌকিক নয়—আন্তরিক। অরবিন্দ তখন জাল বিস্তার করেছিলেন বাংলা থেকে বরোদা একটি বৈপ্লবিক সংগঠনের পরিকল্পনার। নিবেদিতা এই খবর জানতেন। কারণ বাংলার বিপ্লব জীবনের স্পন্দন তিনিও অনুভব করতেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জন্যই সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নি।

নিবেদিতা বুঝতে পারলেন এই মানুষটির ভিতর লুকিয়ে আছে অগ্নিশিখা—যে শিখা আলো দেখাতে পারবে সারা দেশকে। তাই অরবিন্দকে বললেন—"আপনি বাংলা দেশে ফিরে চলুন। বাংলা দেশ আপনাকে চায়। সেখানে আপনার মত লোকের একান্ত প্রয়োজন।"

অরবিন্দ মৃদু হাসলেন। বললেন—"এখনো সময় হয় নি আমার। এ কাজ তো একার নয়। চাই সহযোগিতা।"

নিবেদিতা বললেন—"আপনি কাজে নামলে দেশের অনেক মানুষ আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে। ভয় কি?"

অরবিন্দ বললেন—"ভয় নয়। আমাকেও তৈরী হতে হবে।"

নানা জায়গায় ভ্রমণের পর নিবেদিতা ফিরে এলেন কলকাতায় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। ভাবলেন—এবার কাজের দিকে মন দেবেন।

কিন্তু মাদ্রাজ থেকে আসতে লাগল ডাকের পর ডাক। সে

ডাককে উপেক্ষা করতে পারলেন না নিবেদিতা। মাদ্রাজকে তিনি ভালবাসেন—বিশেষ কারণে মাদ্রাজের প্রতি আছে তাঁর আকর্ষণ। বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করেছিলেন মাদ্রাজবাসীরাই। তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে তাঁকে শিকাগো ধর্মমহাসভায় পাঠানোর জন্য অর্থসংগ্রহ করেছিলেন। বিজয়টিকা নিয়ে যখন তিনি ফিরে এসেছিলেন তখন মাদ্রাজই দিয়েছিল তাঁকে রাজোচিত সম্মান।

বিবেকানন্দের শিষ্যা তাই মাদ্রাজের ডাকে সাড়া দিলেন। গেলেন মাদ্রাজে। পেলেন স্বাগত সংবর্ধনা।

একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে নিবেদিতার কার্যধারা নানা পথে এগিয়ে চলতে লাগল।

স্বামিজী একদিন নিবেদিতা সম্বন্ধে বলেছিলেন—"India shall ring with her"—'সমগ্র ভারত তাঁর নামে একদিন মুখর হয়ে উঠবে।'

সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে চলল।

কলকাতায় ফেরার পর এবার নিবেদিতার প্রথম কাজ হল স্কুলকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা। মাদ্রাজে থাকতেই তিনি স্বামী সদানন্দের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক পরামর্শ করেছিলেন। বেলুড় মঠের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। নিবেদিতাকে তাঁরা ভালবাসতেন—নানা কাজে সাহায্য করতেন।

নিবেদিতা স্থির করলেন—স্কুলটিকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। এর ভিতর দিয়েই সফল করতে হবে স্বামিজীর স্বপ্ন—নিজের জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে শুধু ঐ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা সম্ভব নয়। এবার তাঁর প্রধান ভরসা ক্রিস্টিন। তাঁর উপর দেওয়া হল স্কুলের ভার।

সরস্বতী পূজার পর স্কুল খুলল। তার কিছুদিন পর বয়স্কা

মেয়েদের জন্যও একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় খোলা হল। তাতে ক্রিস্টিন নিলেন সেলাই শেখাবার ভার। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বোন লাবণ্যপ্রভাও এসে যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে। তিনি নিলেন লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব।

কিন্তু মেয়ে কোথায়? এতদিনের লোকাচারের বাঁধ ভেঙে কেউ এগিয়ে আসতে সাহস পায় না বাইরের এই বিদ্যালয়ে।

নিবেদিতা বেরিয়ে পড়লেন ক্রিস্টিন ও লাবণ্যপ্রভাকে সঙ্গে নিয়ে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিভাবকদের বললেন—"আপনারা দয়া করে আপনাদের বাড়ির মেয়ে-বোনদের দিন আমাদের কাছে। আমরা তাদের লেখাপড়া শেখাবো—শেখাবো অনেক কাজ।"

আপত্তি জানান তাতে অনেকে—মেয়েরা যাবে বাইরে? তারা হবে স্বাধীন?

নিবেদিতা বুঝিয়ে বলেন—"তারাও তো মানুষ, মানুষের সব অধিকারই তাদের দিতে হবে। তা ছাড়া লেখাপড়া শিখলে, কাজ শিখলে তারাও হবে আপনাদের সহায়। মেয়েদের অমন করে কেন শুধু সংসারের বোঝা করে রাখবেন?"

এবার বুঝতে পারেন অনেকেই মেয়েদের লেখাপড়া ও কাজ শেখানোর উপযোগিতা। রাজী হন মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে।

বড় বড় মেয়েরা আসেন, বউরা আসেন। আসেন সধবা বিধবা অনেক মেয়ে। এযুগের বাংলা দেশের ইতিহাসে প্রথম এই ঘটনা।

মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলয়েড তখন ইওরোপ ভ্রমণ করছিলেন। তাঁরা চিঠি লিখলেন নিবেদিতাকে—"তুমি এসো, আমাদের সঙ্গী হও।"

নিবেদিতা জবাব দিলেন—"তোমাদের সঙ্গী হতে পারলে সুখীই হতাম। কিন্তু ভারতে আমার কাজ অনেক। এ সময়ে আসা সম্ভব নয়।"

পনেরো

এদিকে ঘনিয়ে এল আর এক সমস্যা।

১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতাকে বেলুড় মঠে ডেকে পাঠালেন।

ব্রহ্মানন্দ বললেন—"স্বামিজী আপনাকে কিসের জন্য ভারতে এনেছিলেন?"

নিবেদিতা বললেন—"ভারতের সেবা করবার জন্য।"

ব্রহ্মানন্দ বললেন—"কিন্তু 'হিন্দু' কাগজে দেখলাম মাদ্রাজে গিয়ে আপনি গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন।"

"তাতে কি আপনারা ভয় পেয়েছেন?"

"ভয় আমাদের নিজের জন্য নয়, ভয় মঠের জন্য। এখনও আপনার নাম মঠের সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে আছে। কাজেই পুলিসের নজর এদিকে পড়বে।"

"তাহলে আমাকে কি করতে বলেন?"

"হয় আপনি রাজনীতি ছাড়ুন, না হয় আমাদের ছাড়ুন।"

নিবেদিতার মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠল। দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন—"রাজনীতি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত। তা কখনো ছাড়তে পারব না।"

ব্রহ্মানন্দ ভেবেছিলেন নিবেদিতা হয়তো তাঁর মত পরিবর্তন করবেন। কিন্তু তা হল না দেখে, বললেন—"তাহলে আপনি এক কাজ করুন। একখানি খোলা চিঠি লিখে কলকাতার সব কাগজে

ছাপিয়ে দিন। তাতে বলে দিন, আপনি স্বেচ্ছায় মঠ ছেড়ে যাচ্ছেন।”

তাই হল। পরদিন নানা কাগজে বের হল নিবেদিতার বিবৃতি— তিনি স্বেচ্ছায় বেলুড় মঠের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

এপ্রিল মাসে নতুন বাড়িতে স্কুল উঠে এল।

স্কুলের মেয়েদের আসা-যাওয়ার জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র একখানি ঘোড়ার গাড়ি কিনে দিলেন। মিসেস ওলি বুল ও আমেরিকার বান্ধবীদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য আসতে লাগল। কলকাতার কয়েকজন ধনী ব্যক্তি এগিয়ে এলেন সাহায্যের জন্য। কিন্তু নিবেদিতা ঠিক করলেন বাইরের লোকের দান তিনি নেবেন না। নিজের দায় নিজেই বহন করবেন। ক্রমাগত লিখে এবং ভাষণ দিয়ে যা উপার্জিত হতে লাগল তা দিয়েই স্কুলের খরচ চালাতে লাগলেন।

প্রাতরাশের সময় থেকে সারাটি সকালবেলা নিবেদিতার বাড়িতে লোকের আনাগোনা। রবিবার ও ছুটির দিন লোক যাওয়া-আসা করে প্রায় সারাক্ষণ। ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ প্রতি রবিবার সকালে নিবেদিতার ঘরে এসে চা খান ও আলোচনা করেন।

আচার্য জগদীশ বসু বিলেত থেকে ফিরে আসার পর নিবেদিতার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তিনি নতুন করে গবেষণায় মন দিয়েছেন যেন। এ ব্যাপারে চাইলেন নিবেদিতার সহযোগিতা। নিবেদিতার কাজ তখন অনেক। তবু গিয়ে দাঁড়ালেন মনীষী বিজ্ঞানীর পাশে। আচার্য বসু তখন লিখছিলেন ‘উদ্ভিদের সাড়া’। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায় পড়ল নিবেদিতার কালির আঁচড়। নিবেদিতার উৎসাহেই আচার্য বসু লিখে চললেন একটির পর একটি বই।

কলকাতার অনুশীলন সমিতি তখন জমজমাট।

সরকারী শ্যেনদৃষ্টি ও ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে যুবকদল তৈরী হচ্ছে দেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য। শরীরকে গঠনের জন্য যুবকরা করছে ব্যায়াম, ডন-বৈঠক, কুস্তি। শিখছে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা। মনকে গঠন করার জন্য পড়ছে তারা বীরপুরুষদের জীবনচরিত, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার কাহিনী। সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস।

নিবেদিতা জড়িয়ে পড়লেন সে দলের সঙ্গে।

তিনি তাঁর সংগ্রহ করা অনেক বই সেই দলের হাতে তুলে দিলেন। তার মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, গ্যারিবল্ডীর জীবনী, জাপানী লেখক ওকাকুরার বই এবং আরও অনেক কিছু।

দেশের মানুষের ভিতর যাতে বিপ্লবী মনোভাব জেগে ওঠে, সেজন্য পিটার ক্রপটকিনের এবং ম্যাটসিনির অনেক বই তিনি বহু লোককে উপহার দিয়েছেন।

সুকিয়া স্ট্রীটে ছিল বিপ্লবীদের একটি ঘাঁটি। সেখানে ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চালানো, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা শেখানো হত। যুবকদের বিপ্লবীভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ছিল বক্তৃতা ও পাঠচক্র।

নিবেদিতা সেখানে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। দিতেন যুবকদের উৎসাহ।

দার্জিলিং। গরমের ছুটিতে নিবেদিতা ক্রিস্টিনকে সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিং এলেন। জগদীশচন্দ্র বসু সেবার কয়েকদিন আগেই চলে এসেছেন। দার্জিলিংয়ে এসে নিবেদিতার দেখা হল গোখেলের সঙ্গে।

গোখেল নিবেদিতাকে বললেন—"সামনের বড়দিনে মাদ্রাজ কংগ্রেস; তখন আপনার স্কুল বন্ধ। যাবেন তো? আপনি কংগ্রেস থেকে সরে আছেন কেন?"

নিবেদিতা বললেন—"কংগ্রেসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও বিশ্বাস করুন, কংগ্রেস আমার চিন্তার বাইরে নয়।"

ডিসেম্বরে নিবেদিতা গেলেন মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে। ফেরার পথে গেলেন বাঁকীপুরে। হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত সভায় নিবেদিতা বললেন—"আমি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলতে পারি যে মুসলমান যুগ থেকে আরম্ভ করে অতীতের এই দীর্ঘ শতাব্দীগুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান এই দেশে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে বাস করেছে।"

উত্তর ভারতের আরো কয়েকটি অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী সম্পর্কে নিবেদিতা বক্তৃতা দিলেন।

নিবেদিতার যেন এ এক নূতন রূপ !

ভারতে তখন লর্ড কার্জনের রাজত্বকাল।

ভারতের মুক্তিযুদ্ধের জন্য একদিকে গড়ে উঠতে লাগল জাগ্রত গণশক্তি—অন্যদিকে তাকে খর্ব করার জন্য চলতে লাগল কার্জনী অপচেষ্টা।

বাংলা দেশকে ভাগ করা হল। দেশের সংহতিকে খণ্ডবিখণ্ড করবার জন্য লর্ড কার্জনের এই হল শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ।

এই সর্বনাশা নীতিকে কেন্দ্র করে ভারতে জ্বলে উঠল বিক্ষোভের আগুন। সেই আগুনের ছোঁয়া লাগল নিবেদিতার বুকেও।

লর্ড কার্জন কলকাতায় এলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন—"প্রাচ্যের লোকদের চেয়ে পাশ্চাত্যের লোকেরাই সত্যের মর্যাদা বেশী দিয়ে থাকে।"

সভায় উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এ কথায় সবাই ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহসী হলেন না।

সভা শেষ হয়ে গেল। লর্ড কার্জন চলে গেলেন! নিবেদিতা দর্শকের আসনে বসে রাগে ও উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। এবার উঠে দাঁড়ালেন।

তখন সেনেট হলের দরজায় দাঁড়িয়ে বড়লাটের সেই উক্তির সমালোচনা করছিলেন স্যার গুরুদাস। নিবেদিতা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন—"লর্ড কার্জন মিথ্যাবাদী।"

অনেকে অবাক্ হয়ে তাকালেন নিবেদিতার দিকে। নিবেদিতা বললেন—"কেউ আমাকে কার্জনের লেখা 'প্রবলেমস অব দি ফার ঈস্ট' বইটি যোগাড় করে দিতে পারেন? তাহলে এখনি আমি দেখিয়ে দিতে পারি তিনি কত বড় মিথ্যাবাদী।"

বই যোগাড় হয়ে গেল। বই খুলে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিবেদিতা বললেন—"দেখুন।"

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখলেন—লর্ড কার্জন তাঁর নিজের লেখা বইয়ে কোরিয়া ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলেছেন—কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নিজের বয়স তেত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরে বাড়িয়ে প্রেসিডেন্টের আস্থাভাজন হয়েছিলেন।

নিবেদিতা বললেন—"দেখলেন, লর্ড কার্জন নিজে কত বড় মিথ্যাচারী! এ সম্বন্ধে আমি লিখব। কিছুতেই তাঁকে ছাড়বো না।"

সেই রাত্রেই নিবেদিতা কঠোর ভাষায় লর্ড কার্জনের বক্তৃতার জবাব লিখলেন। রাত্রেই তিনি দেখা করলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকের সঙ্গে।

পরদিন সকালেই 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' নিবেদিতার লেখাটি ছাপা হল। নিবেদিতার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল সারা দেশের মানুষ। ধন্য ধন্য বিদেশিনী!

নিবেদিতা এতেই ক্ষান্ত হলেন না। দুদিন কঠোর পরিশ্রম করে রচনা করলেন আর একটি প্রবন্ধ। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় তা ছাপা হল।

পাশ্চাত্যের মেয়ে হয়েও প্রাচ্যের পক্ষ হয়ে নিবেদিতার এমন কথা বলার সাহস দেখে ভারতবাসী মুগ্ধ হল।

নিবেদিতা বিদেশিনী হলেও ভারতবর্ষের সেবার জন্যই জীবনের সব কিছু নিয়োজিত করেছেন। এই আত্মত্যাগের কোন তুলনা হয় না।

তবে অনেক কাজই নিবেদিতা করতেন নীরবে।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন—"ভগিনী নিবেদিতা যে সকল কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাহার কোনোটারই আয়তন বড় ছিল না। তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড় আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল; তাহাকে আকারে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না।

এই জন্যই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা, তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মত একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না, এও সেইরূপ।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন—"নিবেদিতা ছিলেন লোকমাতা। নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে

তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল। মানুষের মধ্যে যে শিব আছে সেই শিবকেই এই সতী আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। লোকসাধারণই তাঁহার হৃদয়ের ধন ছিল।"

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে বললেন—"চলো, দার্জিলিং থেকে ঘুরে আসি।"

জগদীশচন্দ্র বললেন—"আমি তো যাবার জন্য তৈরী হয়েই আছি। চলো।"

প্রতিবছরই জগদীশচন্দ্র গরমের সময় ও পূজার সময় দার্জিলিং, মায়াবতী বা মুসৌরী ঘুরে আসেন। সঙ্গে থাকেন নিবেদিতা, ক্রিস্টিন ও অবলা বসু। কাজের চাপে যখন জর্জরিত হয়ে ওঠেন তখন সেখানে গিয়ে করেন বিশ্রাম।

কিন্তু সেবার বিশ্রান করা হল না। উদ্বিগ্ন মন নিয়ে নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এলেন।

কিন্তু ফিরে এসেই শুনলেন তিনি সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়েছেন, পুলিস তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছে। এই বাড়িতে কারা কারা আসে, কেনই বা আসে, তা নিয়ে পুলিসের মাথাব্যথার অন্ত নেই। আশে-পাশে ঘুরে তারা খোঁজখবর নেয়।

তবু নিবেদিতার বাড়িতে লোকের আনাগোনার বিরাম নেই। বরং দিনে দিনেই বাড়তে থাকে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আসেন—"লেখা দিন 'প্রবাসী'র জন্য।"

মতিলাল আসেন—"'অমৃতবাজারে'র জন্য লেখা দিন।"

সতীশচন্দ্র আসেন 'ডন' পত্রিকার লেখার জন্য। র‍্যাটক্লিফ 'স্টেটসম্যান'-এর জন্য জোর করে লেখা লিখিয়ে নিয়ে যান।

বিপিনচন্দ্র পালও আসেন। তিনি নিবেদিতার গুণগ্রাহী।

কিছুকাল আগে এক সভা হয়েছিল কলকাতার টাউন হলে। বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন সভাপতি। নিবেদিতা বক্তৃতায় বলেছিলেন—"...ধর্মজগতে আজ সাড়া এসেছে নানাভাবে। ভারতবর্ষের মূল সমস্যা যদিও আধ্যাত্মিক, তবু 'ন্যাশনালিটি' কথাটির বিপুল ব্যঞ্জনা হৃদয়ংগম করলে তবেই সিদ্ধি আসবে। যে সব আচার-বিচারে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটে, ধর্ম তার মধ্যে নেই। আজ সবার আগে দরকার সঙ্ঘশক্তির। সেই ধর্মই ধর্ম যাতে জাতির প্রাণশক্তি জেগে ওঠে।"

বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র। সেই থেকে এক নূতন দৃষ্টিতে তিনি নিবেদিতাকে দেখতে লাগলেন।

সময় পেলেই তিনি আসেন নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে। বলেন—"লেখা দাও 'নিউ ইণ্ডিয়া'র জন্য।"

নিবেদিতা কাউকে বিমুখ করতে পারেন না। কলম চলে তাঁর অবিশ্রান্ত গতিতে।

চিঠি আসে তিলকের 'মহারাষ্ট্র' থেকে, বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' থেকে। সাগরপার থেকেও আসে লেখার জন্য আমন্ত্রণ। লণ্ডনের 'ওয়েস্ট মিনিস্টার রিভিউ', আমেরিকার 'বোস্টন হেরাল্ড' প্রভৃতি কাগজের জন্যও নিবেদিতাকে কলম ধরতে হয়।

শুধু কি লেখা? বক্তৃতার জন্য আহ্বানও আসে অনেক জায়গা থেকে। লেখনী ও রসনা চলে সমান তালে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ এলেন নিবেদিতার বাড়ি। কথায় কথায় বললেন—"দেখুন সিস্টার, আমার ছোট মেয়েটিকে ভাল করে ইংরেজী শেখাতে চাই। আপনি শেখাবেন আমার মেয়েকে ইংরেজী?"

নিবেদিতা বললেন—"সে কি, ঠাকুরবংশের মেয়েকে বিলিতী খুকী বানাতে চান? বাইরে থেকে কোন একটা শিক্ষা গিলিয়ে দিয়ে লাভ কি?"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"তবু তো একটা ভাষা শিক্ষা হবে।"

নিবেদিতা বললেন—"না, বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষায় নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে চাপা দেওয়া আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

রবীন্দ্রনাথ তখন এ ব্যাপারে তাঁকে আর অনুরোধ করলেন না। পরে একদিন বললেন—"জোড়াসাঁকোয় আমার বাড়িতে অনেক জায়গা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় মেয়েদের জন্য একটা স্কুল করি।"

নিবেদিতা বললেন—"সে তো ভাল কথা।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"কিন্তু আপনার সহায়তা না হলে তো হবে না।"

নিবেদিতা ভাবলেন একটু। তারপর বললেন—"আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুবই খুশী হতাম। কিন্তু আমার কাজ যে অসংখ্য। তবু আপনার কথা ভেবে দেখব। আপনার 'গোরা' উপন্যাস কতদূর এগোল?"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"অনেকটা এগিয়েছে। আপনাকে একদিন পড়িয়ে শোনাব।"

রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন এসেছেন নিবেদিতার বাড়িতে। নিবেদিতা ভাল বাংলা শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুরাগিণী ছিলেন তিনি। 'কাবুলীওয়ালা' গল্পের অনুবাদও করেছিলেন নিবেদিতা।

'গোরা' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে নিবেদিতার চরিত্রকে কেন্দ্র করেই। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে নিবেদিতার জীবনকে বুঝতে পেরেছিলেন, সেই জটিল মুক্তিতেই গোরাকে নিয়ে গেছেন। এই বইয়ের অনেক অংশ নিবেদিতা শুনেছেন কবিগুরুর মুখ থেকে, কিন্তু বইটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। গোরা প্রকাশিত হবার তেরো বছর আগেই নিবেদিতা ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ একসময়ে বেশ কিছুদিন শিলাইদহে ছিলেন। নিবেদিতা কয়েকবার গিয়েছিলেন সেখানে। প্রথম যান আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে। পদ্মার পাড়ে সেই গ্রামের মাটিতে পা দিয়ে নিবেদিতার কী আনন্দ! পল্লীর দিকে তাঁর যে প্রাণের কত টান তা শিলাইদহ যাওয়ার পরই বোঝা গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুধুমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমান-রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।"

সচল কর্মের প্রতিমূর্তি নিবেদিতা।

মাথায় কাজের বোঝা—মনে কাজের চিন্তা। কাজ ছাড়া যেন তিনি কিছু জানেন না।

এত পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ল। ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে পড়লেন অসুখে।

খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। খবর পেয়ে ছুটে এলেন জগদীশ বসু, এলেন শ্রীমা সারদা দেবী। গোখেল তখন কলকাতায় ছিলেন, তিনিও ছুটে এলেন।

ভয়ানক জ্বর। জ্বর আর ছাড়ে না। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন টাইফয়েড।

জীবন সংশয়। গোখেল কোন অভিজ্ঞ ইওরোপীয়ান ডাক্তার নিয়ে আসার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু নিবেদিতা বললেন—"না না, সাহেব ডাক্তার দেখাতে হবে না।"

তখন জগদীশচন্দ্র নিয়ে এলেন ডাক্তার নীলরতন সরকারকে। নীলরতন তখন বাংলাদেশের একজন সেরা ডাক্তার।

নিবেদিতার বাড়িটি অস্বাস্থ্যকর। তাই জগদীশচন্দ্র তাঁর বাড়ির কাছেই একটি আলোবাতাসযুক্ত বাড়ি ঠিক করলেন। সেখানেই নিবেদিতাকে নিয়ে আসা হল।

ত্রিশ দিন ধরে চলল সমানভাবে জ্বর। বিরাম নেই। চিকিৎসা এবং সেবাযত্নেরও ত্রুটি নেই। ভগিনী ক্রিস্টিন আহার-নিদ্রা ভুলে শুশ্রূষা করেন। গোখেল মাথায় আইসব্যাগ ধরে বসে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ঘন ঘন আসেন। জগদীশচন্দ্রের ছুটোছুটির অন্ত নেই।

মনে হয়েছিল নিবেদিতা বুঝি আর বাঁচবেন না। অনেক চেষ্টা ও যত্নে সেবার বেঁচে উঠলেন।

আরোগ্যলাভের পর জগদীশচন্দ্র নিবেদিতাকে দার্জিলিং নিয়ে গেলেন। সেখানে বিশ্রামলাভের মধ্যেও চলল নিবেদিতার কাজ। জগদীশচন্দ্র নূতন যে বইটি লিখেছিলেন তা বসে বসে শোনান নিবেদিতাকে। নিবেদিতা তার সংশোধন করেন, অনুলিপি করে দেন। এমনি করে গোটা একটি বই-ই লেখা হয়ে গেল।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে নিবেদিতা ফিরলেন কলকাতায়।

কলকাতায় পা দিয়েই বুঝতে পারলেন—মাটি উত্তপ্ত। স্বদেশী আন্দোলনের যে আগুন ধূমায়িত অবস্থায় ছিল এবার তা জ্বলে ওঠবার প্রতীক্ষায়!

নিবেদিতা সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন জেনে অনেকেই গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তরুণদল এসে চাইল তাঁর পরামর্শ। নিবেদিতা উৎসাহ দিলেন সবাইকে। বললেন—“বুক বাঁধ। ধৈর্য হারিও না। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের তৈরী থাকতে হবে।”

রাতের অন্ধকারে এলেন চুপি চুপি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। স্বামিজীর সহোদর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ। চেহারা ও চালচলনে

তাঁর মধ্যে স্বামিজীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পান নিবেদিতা। কিন্তু এঁর প্রকৃতি আলাদা। অন্তরে জ্বলন্ত বিদ্রোহের ভাব।

নিবেদিতা তাঁর হাতে একদিন তুলে দিয়েছিলেন ক্রপটকিনের বই আর আইরিশ বিপ্লবের ইতিহাস। সে সব বই পড়ে ভূপেন্দ্রনাথ প্রেরণা পেয়েছেন। হয়ে উঠেছেন নিবেদিতার আরও বেশী ভক্ত।

অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রনাথের শিরায় শিরায় বিপ্লবের রক্ত। তিনি চান নিবেদিতার সাহায্য—চান তাঁর আশীর্বাদ।

অগ্নিযজ্ঞের ইন্ধন তৈরী—এখন চাই শুধু একটু আগুনের স্পর্শ।

ওদিকে আবার সাড়া পড়ে গেছে দেশে। বারাণসীতে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসবে। এবার গোখেল সভাপতি।

গোখেল মাত্র কয়েকদিন আগে বিলেত থেকে ফিরেছেন। দেশে হুজুগ উঠেছে—বিলিতী দ্রব্য বর্জন। সমস্ত দেশ গোখেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

গোখেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নিবেদিতা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অধিবেশনের তিনদিন আগেই হাজির হলেন কাশীতে।

গোখেলের সঙ্গে দেখা হল—আলোচনা হল অনেক কিছু। নিবেদিতা বললেন—"কংগ্রেস যেন বয়কট সমর্থন করে।"

গোখেল বললেন—"কিন্তু বয়কট কথাটির মধ্যে একটা প্রতিশোধ ও বিদ্বেষের ভাব রয়েছে না?"

নিবেদিতা একটু উত্তেজিত ভাবেই বললেন—"প্রতিশোধ ও বিদ্বেষই তো এখন আমাদের একমাত্র পথ।"

কাশীর এই কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রতি নিবেদিতার আকর্ষণের আরও কয়েকটি কারণ রয়েছে। এই অধিবেশনে আসছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। অরবিন্দ বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। তিনিও কাশীর এই কংগ্রেসে যোগ দেবেন।

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন শুরু হল। বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে নির্দিষ্ট সময়ে গোখেল তোরণের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। কংগ্রেস সভাপতিকে স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে এলেন নিবেদিতা। তাঁর সামনে ধরলেন এক পাত্র দুধ—বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ। তারপর গলায় পরিয়ে দিলেন মালা।

মৃদু কণ্ঠে নিবেদিতা বললেন—"দেখবেন, বয়কটের দাবি যেন কংগ্রেস মেনে নেয়।"

গোখেল মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন—"এ দাবি কি তোমার?"

নিবেদিতা ধীর অথচ কঠোর কণ্ঠে জবাব দিলেন—"না, এ দাবি সমগ্র বাঙালীর—সমগ্র জনতার।"

অধিবেশনের কাজ শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন "বন্দে মাতরম্" গান। গোখেল উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চে। জনতা বিপুল হর্ষ ও করতালির ধ্বনিতে অভিনন্দিত করল কংগ্রেস সভাপতিকে।

এমনি ভাবে জনতা তাঁকে আবার অভিনন্দন জানাল, যখন বয়কট সমর্থন করে তিনি করলেন সগর্ব ঘোষণা।

জনতার দাবি গ্রাহ্য হল—গৃহীত হল নিবেদিতার প্রস্তাব। জয় হল নিবেদিতার।

কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বরের একটি সরু গলির মধ্যে নিবেদিতা ঘর নিয়েছেন। অধিবেশনের পরদিন সন্ধ্যাবেলায় অরবিন্দ এলেন নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে। এলেন রমেশচন্দ্র এবং নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের আরও কয়েকজন নেতা। অনেক রাত অবধি তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলল।

নিবেদিতার ঘরটি নেতাদের আলোচনা-কেন্দ্র হয়ে উঠল। গোখেলও আসেন মাঝে মাঝে।

অধিবেশনের প্রদত্ত ভাষণ নিবেদিতার কাছেই প্রথম আসে।

ইংরেজীতে অনুবাদ করেন নিবেদিতা। তারপর সেগুলি প্রচারের ব্যবস্থা হয়।

সম্মেলনের অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে নিবেদিতার উপর।

নিবেদিতা একদিন অরবিন্দকে বললেন—"বিপ্লব আসতে আর দেরি নেই। আপনার কি মনে হয়?"

অরবিন্দ বললেন—"বিপ্লব এসে গিয়েছে।"

নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন—"বয়কট প্রস্তাব কি আপনারই রচনা?"

অরবিন্দ বললেন—"হ্যাঁ।" তারপর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন —"কিন্তু আপনি কেমন করে বুঝলেন?"

নিবেদিতা বললেন—"প্রস্তাবটি পাঠ করার পরই আমার সে ধারণা হয়েছিল। আমার নিজেরও খুব ঝোঁক ছিল প্রস্তাবটির উপর। তাই আমি গোখেলের উপর এত চাপ দিয়েছিলাম।"

অরবিন্দ হাসলেন। কৃতজ্ঞতার হাসি।

নিবেদিতা বললেন—"কিন্তু আর কতকাল অন্তরালে থাকবেন? লগ্ন তো এসে গেল।"

অধিবেশন শেষ হয়ে গেলেও নিবেদিতা কাশী রয়ে গেলেন। স্বামীজীর উৎসাহে অনেকদিন আগে এখানে একটি সেবাশ্রম গড়ে উঠেছিল। তার অবস্থা এখন শোচনীয়।

নিবেদিতা ইংরেজীতে তার কার্য-বিবরণী ও আবেদন-পত্র লিখে দিলেন এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেবাশ্রমের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করতে লাগলেন।

বহুদিন থেকে তাঁর রাজপুতানা ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। এবার সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কাশী থেকে রওনা হয়ে প্রথমে দর্শন করলেন সাঁচীর বিখ্যাত স্তূপ। তারপর উজ্জয়িনী, চিতোর…।

চিতোর দুর্গে পা দিয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন নিবেদিতা। পদ্মিনীর বীরত্বব্যঞ্জক ও মর্মস্পর্শী কাহিনী অনেকদিন আগেই তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল। এবার সেই ভারতীয় নারীর স্মৃতিরঞ্জিত দুর্গে পা দিয়ে তাঁর অন্তরে শিহরন জেগে উঠল।

নিবেদিতা পাথরের উপর হাঁটু গেড়ে বসলেন। চোখ বুজে হাত জোড় করে স্মরণ করলেন পদ্মিনীর কথা।

প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সামনে পদ্মিনী একদিন এমনি ভাবেই হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন।

চোখ বুজে পদ্মিনীর সেই শেষ চিন্তা মনে আনবার চেষ্টা করলেন নিবেদিতা।

বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারলেন না। বুকের ভিতর থেকে বেদনা ও উত্তেজনার আবেগ এসে তাঁর প্রাণমনকে চঞ্চল করে তুলল।

পাহাড়ের মাটি মাথায় স্পর্শ করে ধীরে ধীরে নেমে এলেন নিবেদিতা।

১৯০৬ সালের ৪ঠা জুন। কলকাতার টাউন হলে শিবাজী উৎসব। উদ্যোক্তা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও অশ্বিনীকুমার দত্ত।

উৎসবের কয়েকদিন আগে একদিন সন্ধ্যায় দুজনেই বাগবাজারে এলেন নিবেদিতার সঙ্গে পরামর্শ করতে। নিবেদিতার সঙ্গে অশ্বিনীকুমারের এই প্রথম আলাপ।

অশ্বিনীকুমার বললেন—"স্বামিজী বলেছিলেন, বাঙলার যুবকদের হাড় থেকে যে বজ্র তৈরী হবে সেই বজ্র দিয়ে ঘুচবে ভারতের অধীনতা।"

নিবেদিতা বললেন—"সেই বজ্র তৈরির কাজেই আমরা হাত দিয়েছি। স্বামিজীর দুটি কথা আমাদের ইষ্টমন্ত্র—কর্মযোগ আর অখণ্ড ভারত।"

ব্রহ্মবান্ধব বললেন—"আমাদেরও ইষ্টমন্ত্র তাই। তাই আমরা শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেছি। এই উৎসবের ভিতর দিয়েই হবে মারাঠি ও বাঙালীর মধ্যে ঐক্যবন্ধন।"

নিবেদিতা বললেন—"আমার খুব আনন্দ হচ্ছে আপনাদের এই প্রচেষ্টা দেখে।

ব্রহ্মবান্ধব বললেন—"আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ আপনাকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। আপনি তাঁকে বলুন এই উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে পাঠ করতে।"

নিবেদিতা বললেন—"বেশ, আমি সেই ভার নিচ্ছি।"

তিনি পরদিনই জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। সব কথা জানিয়ে বললেন—"কবি, জাতীয় জাগরণের মন্ত্র আপনি ছড়িয়েছেন 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গান দিয়ে। এবার রচনা করতে হবে একটি মিলন-মন্ত্র।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"আপনার অনুরোধ আমার কাছে দেশ-মাতৃকার আদেশের মত। কাজেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

উৎসবের দিন টাউন হলে জনতার মাঝে কী উৎসাহ উদ্দীপনা! এসেছেন মহারাষ্ট্র কেশরী লোকমান্য তিলক। নিবেদিতা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। জাতির কবি রবীন্দ্রনাথ উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করলেন স্বরচিত কবিতা—

মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজি'
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।···

কবিতার ভাবে ও ছন্দে সভার মাঝে যেন এক নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি হল। নিবেদিতা হলেন বিস্ময়ে মুগ্ধ ও হতবাক্। তিলক তাঁর ভাষণে বললেন—"মারাঠার সঙ্গে বাংলার মিলন ইতিহাসের ইঙ্গিত। আজ ভারতবাসীকে এক শক্তিতে পরিণত করবার, এক পতাকার তলে সমবেত করবার দিন।"

ষোলো

১৯০৬ সালে নিবেদিতা পেলেন দুটি শোকের আঘাত—স্বামী স্বরূপানন্দ ও গোপালের মায়ের মৃত্যু।

স্বামী স্বরূপানন্দের কথা ভুলতে পারবেন না নিবেদিতা। আলমোড়ায় তিনি কত বড় মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তা ছাড়া বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে কত সময়েই তিনি সাহায্য করেছেন নিবেদিতাকে। আর গোপালের মা? তিনি ছিলেন তাঁর স্নেহময়ী ঠাকুরমায়ের মত।

গোপালের মা রোগে ও জরায় কাতর হয়ে পড়লে স্বামী সারদানন্দ তাঁকে কামারহাটি থেকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। কিছুদিন তাঁকে রাখা হল রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়িতে। তারপর নিবেদিতা একদিন বললেন—"ওখানে কেন, আমার বাড়িতেই গোপালের মা থাকবেন।"

সেই থেকে গোপালের মা রইলেন নিবেদিতার বাড়িতে একটি আলাদা ঘরে। একটি ব্রাহ্মণের মেয়েকে রেখে দেওয়া হল তাঁর পরিচর্যার জন্য—নাম কুসুম।

রোজ অনেক কাজের মধ্যেও নিবেদিতা গোপালের মায়ের খবর নিতেন। একবার করে কাছে বসতেন। গোপালের মা যখন শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তখন কী দুশ্চিন্তা হল নিবেদিতার! রোজ এসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, আস্তে আস্তে পা টিপে দিতেন।

জুলাই মাসে গোপালের মার অন্তিমকাল উপস্থিত হল। ব্যবস্থা হল তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়ার। নিবেদিতা নিজে ফুল, চন্দন ও মালা দিয়ে তাঁর বিছানা সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দিলেন। খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন করে তাঁকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হল। নিবেদিতা খালি পায়ে সঙ্গে সঙ্গে চললেন। এরপর গঙ্গাতীরে গোপালের মা যে দু'দিন জীবিত ছিলেন নিবেদিতাও ছিলেন তাঁর কাছে।

কেটে গেল কতকগুলি মন্থর ও নিরানন্দময় দিন। এর মধ্যে খবর এল, পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। বেলুড় মঠ থেকে কয়েকজন সন্ন্যাসী কর্মীকে পাঠানো হল সেবাকাজের জন্য। সেখান থেকে যতই ভয়াবহ খবর আসতে লাগল ততই নিবেদিতার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি পূর্ববঙ্গে চলে গেলেন।

এর আগে যাঁরা এসেছিলেন, নিবেদিতা মিশে গেলেন তাঁদের সঙ্গে। নৌকায় চড়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে দুর্গত মানুষকে সাহায্য করতে লাগলেন।

একজন নারী এসেছেন এমনভাবে সেবাকার্যে সাহায্য করতে! এ দৃশ্য তখনকার যুগে নূতন। তাই দুর্গত মানুষের চোখে বিস্ময় কিন্তু মনে আনন্দ।

একটি গ্রামের নারীরা দল বেঁধে তাঁকে বিদায় দেবার জন্য নদীর তীর পর্যন্ত এগিয়ে এল। নৌকা ছেড়ে দিলে পিছনে তাকিয়ে নিবেদিতা দেখলেন তারা প্রার্থনার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো তারা বলছে—'হে অচেনা নারী, তুমি আমাদের শ্রদ্ধা লও।'

কৃতজ্ঞতায় নিবেদিতার চোখে জল এল।

পূর্ববঙ্গ থেকে ফেরার পর নিবেদিতা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত

হয়ে পড়লেন। প্রাণপণে তাঁর সেবাযত্ন করতে লাগলেন ক্রিস্টিন, আচার্য বসু এবং তাঁর স্ত্রীও এসে দেখাশোনা করতে লাগলেন। বেলুড় মঠের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ মাঝে মাঝে এসে তাঁকে দেখে যেতেন।

কিছুদিন চিকিৎসার পর রোগ সেরে গেল। কিন্তু শরীর দুর্বল। শ্রীআনন্দমোহন বসু অনুরোধ করলেন তাঁর দমদমের আরামকুঠি বাগানবাড়িতে নিবেদিতাকে কিছুদিন কাটিয়ে যাবার জন্য। ক্রিস্টিনকে নিয়ে নিবেদিতা চলে গেলেন সেখানে।

একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নিবেদিতা। বই লেখার কাজে মন দিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর অরবিন্দ এলেন। নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন—"কংগ্রেসের খবর কি ?"

অরবিন্দ বললেন—"ভাল নয়। বড় দলাদলি চলছে।"

নিবেদিতা বললেন—"কংগ্রেসের মধ্যে কিছুমাত্র অনৈক্য না থাকে, এই আমার ইচ্ছা। গুরুর আদর্শ ছিল অখণ্ড ভারত। অখণ্ড কংগ্রেস না হলে অখণ্ড ভারত কি সম্ভব ? ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ ঘুরে বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি ঐক্যের সন্ধান পেয়েছি। এটি একটি আদর্শ। আদর্শের জন্য মরেও সুখ আছে।"

অরবিন্দ বললেন—"কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে এ আদর্শ বাস্তব রূপ নেবে বলে তো আমার মনে হয় না। কংগ্রেসের বিরোধ বেড়েই চলেছে। কলকাতা কংগ্রেসে এবার তা প্রত্যক্ষ করলাম।"

নিবেদিতা বললেন—"হতাশ হলে চলবে না। কাজ আমাদের করে যেতেই হবে।"

অনেক আলাপ-আলোচনার পর অরবিন্দ চলে গেলেন।

১৯০৭ সালের প্রথম দিকেই মিসেস সেভিয়ার এলেন কলকাতায়।

নিবেদিতা দমদমে আছেন জেনে সেখানেই চলে গেলেন।

নিবেদিতার চেহারা দেখে চমকে উঠলেন মিসেস সেভিয়ার—"একি চেহারা হয়েছে তোমার?"

নিবেদিতা মৃদু হাসলেন। কোন কথা বললেন না।

সেভিয়ার বললেন—"চলো আমেরিকা ইওরোপ ঘুরে আসি। শরীরটা তাহলে একটু ভাল হবে।"

সিবেদিতা বললেন—"কিন্তু এদিকে কাজ যে অনেক। যাই কেমন করে?"

সেভিয়ার বললেন—"তবু তোমায় যেতে হবে।"

নিবেদিতার শরীরের অবস্থা দেখে তাঁর কাছেই সেভিয়ার রয়ে গেলেন।

নিবেদিতাও ভাবছিলেন ইওরোপ আমেরিকা ঘুরে আসবেন। কিন্তু এমন সময় সরকারের ভেদনীতির ফলে কুমিল্লায় বেধে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সঙ্গে সঙ্গে জামালপুরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। নিবেদিতার মন দুঃখে ও বেদনায় ভরে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন স্বদেশী আন্দোলনকে আঘাত করবার জন্যই ব্রিটিশ সরকারের এই অস্ত্র নিক্ষেপ।

নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে পাঠালেন জামালপুরে। বললেন—"ওখানকার অবস্থাটা একবার দেখে এসো।"

ভূপেন্দ্রনাথ জামালপুরে চলে গেলেন।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক তখন ভূপেন্দ্রনাথ। সরকারের এই হীন চক্রান্তকে ভ্রূকুটি করে নানা রচনা ছাপা হতে লাগল সেই কাগজে। অরবিন্দ বাঙালীর পৌরুষকে ধিক্কার দিয়ে লিখলেন একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধ নয় যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ।

"বন্দে মাতরম্"-এর সেই প্রবন্ধ সারা দেশে যেন উত্তেজনার অগ্নিস্রোত বইয়ে দিল। টাউন হলে এক সভার আয়োজন হল সেই সময়। সভাপতি বিপিন পাল। নিবেদিতা অগ্নিময়ী ভাষায়

আহ্বান জানালেন জনগণকে—"আর কথা নয়। আসুন, এবার আমরা কাজ শুরু করি।"

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন পুলিস 'যুগান্তর' অফিসে হানা দিল। তছনছ করে খানাতল্লাশ করল অফিস-ঘর। সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তখন নিবেদিতার নির্দেশে জামালপুরে।

দু'দিন পরে ভূপেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরলেন। 'যুগান্তর' অফিসে পা দিতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করল।

'যুগান্তর'-এ দুটি আপত্তিজনক প্রবন্ধ ছাপা হওয়ার জন্য ভূপেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনা হল রাজদ্রোহের অভিযোগ। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর জন্য বিশহাজার টাকা জামিন তলব করলেন। খবর পেয়েই নিবেদিতা ছুটলেন নিজেই জামিন হওয়ার জন্য।

'ইংলিশম্যান' কাগজ নিবেদিতাকে ভর্ৎসনা করে লিখলেন—"এই নারী নিজের জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক।"

বিচারে ভূপেন্দ্রনাথের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। হাসিমুখে তিনি দণ্ডাদেশ মাথা পেতে নিলেন।

মামলার রায় বের হবার পরই নিবেদিতা আদালত থেকে সোজা চলে এলেন গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে। ভুবনেশ্বরী দেবী তখন বিষণ্ণ বদনে বসে ছিলেন। নিবেদিতা ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন। বললেন—"মা, আপনি মুখ ভার করে বসে আছেন কেন? আজ আপনার যে বড় আনন্দের দিন। আপনার এক ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, আজ আর এক ছেলে দেশের জন্য হাসি-মুখে জেলে গেল।"

নিবেদিতার কথায় ভুবনেশ্বরী অনেক দুঃখেও সান্ত্বনা পেলেন।

এদিকে রাজরোষের অগ্নিদৃষ্টি নিবেদিতার উপরেও এসে পড়ল।

জগদীশচন্দ্র চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। তিনি নিবেদিতার মনকে বিজ্ঞান সাধনার কাজে লিপ্ত রাখতে চাইলেন। দিতে লাগলেন কাজের পর কাজ।

কিন্তু কী আশ্চর্য মেয়ে নিবেদিতা! সব কাজই তিনি অম্লান বদনে করে যেতে লাগলেন। আচার্য বসুর 'Plant Response' বইটি বিজ্ঞান জগতে নিয়ে এল বিপুল সাড়া। এর প্রকাশের মূলে নিবেদিতার কৃতিত্ব অনেকখানি। Comparative Electro-Physiology বইটি বার হল নিবেদিতার সহযোগিতা নিয়েই। আর এটি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসতে লাগল অনেক আমন্ত্রণ।

নিবেদিতাই বিদেশের এই সমস্ত চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করতে লাগলেন। সরকারের সঙ্গেও লেখালেখি চলতে লাগল। ভারত সরকার তখন বাধ্য হলেন জগদীশচন্দ্রকে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পাঠাতে। জগদীশচন্দ্রও বিদেশযাত্রার জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

এদিকে নিবেদিতার কাছে আসতে লাগল মিস ম্যাকলয়েড ও অন্যান্য বান্ধবীদের অনুরোধের পর অনুরোধ। নিজেরও অনেক দরকার ছিল। ক্রিস্টিনের উপর স্কুলের ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি একটু নিশ্চিন্ত হলেন।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি নিবেদিতা কলকাতা থেকে যাত্রা করলেন পাশ্চাত্ত্যের অভিমুখে।

তবু মন তাঁর পড়ে রইল কলকাতায়।

সেখানে তখন অগ্নিযুগ তার শিখা বিস্তার করছে।

সতেরো

নিবেদিতা লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন।

পাঁচ বছর পরে মা ও ভাইবোনের সঙ্গে দেখা হল।

সবার মনে কী আনন্দ!

নিবেদিতা ভাইবোন ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য ভারত থেকে নিয়ে এসেছেন অদ্ভুত সব উপহার। তার মধ্যে আছে মাটির প্রদীপ, ধূপদানি, পাথরের মুড়ি, নানারকমের মালা, ছোট ছোট বেতের বাক্স এবং আরও কত কি! কৃষ্ণ, গোপাল, কালী প্রভৃতি দেবতার ছোট ছোট পটও নিয়ে এসেছেন সঙ্গে। আর বোতলে করে এনেছেন গঙ্গাজল।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মা অবাক্ হয়ে যান। কী এক বিমল স্বর্গীয় জ্যোতি যেন মেয়ের চোখে মুখে।

নিবেদিতা বলেন মায়ের কাছে স্বামিজীর কথা, গোপালের মায়ের কথা। গোপালের মায়ের মালাটি নিবেদিতা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। সেটা বের করে মাকে বলেন—"মা, এটা স্পর্শ কর।"

মেরী স্পর্শ করেন। মনে তাঁর কী যেন এক শিহরন জেগে ওঠে।

ওদিকে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ইওরোপে এসে গেলেন। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলয়েডের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। মিসেস বুলও এলেন আমেরিকা থেকে।

নিবেদিতা এবার তাঁর বইগুলি নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'The Web of Indian Life' আগেই পাশ্চাত্ত্য জগতে সাড়া জাগিয়েছে। এবার 'Cradle Tales of Hinduism' প্রকাশিত হল। বিলেতের লংম্যান কোম্পানি বইটি প্রকাশ করলেন। এই বইটিরও সমাদর হল খুব।

নিবেদিতা আবার পরিচিত মহলে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে এলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, গোখেল ও আনন্দকুমার স্বামী। তাঁদের দেখা পেয়ে নিবেদিতার খুব আনন্দ হল। রমেশচন্দ্র ও গোখেলের সঙ্গে চলতে লাগল তাঁর রাজনীতি চর্চা আর আনন্দকুমার স্বামীর সঙ্গে চলতে লাগল মহাভারত পাঠ ও আলোচনা। দিনগুলি আনন্দমুখর হয়ে উঠল।

একমাস পরে নিবেদিতা আচার্য বসুর সঙ্গে আমেরিকা চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন বাংলাদেশের কয়েকজন পলাতক বিপ্লবী যুবক আমেরিকায় পালিয়ে এসেছে। তারা আশ্রয় নিয়েছে স্বামিজীর শিষ্যা মিসেস ওলি বুলের কাছে। ভূপেন্দ্রনাথও এগারো মাস জেল খাটার পর চলে এসেছেন আমেরিকায়।

নিবেদিতার এখন প্রধান কাজ হল এই সব পলাতকদের থাকার ব্যবস্থা করা। যাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারে এবং লেখাপড়া শিখতে পারে তার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে এজন্য টাকা পয়সাও সংগ্রহ করতে লাগলেন। কে কি পড়বে তাও ঠিক করে দিলেন নিবেদিতা।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর জীবনপঞ্জীতে লিখেছেন—"নিবেদিতা এবং আচার্য বসু আমাকে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার পাঠ্যতালিকা ঠিক করে দিয়েছিলেন।"

আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে আচার্য বসু তখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। স্থির হল, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা শেষ হলেই নিবেদিতাকে নিয়ে একসঙ্গে ভারতে ফিরবেন।



রোগশীর্ণা নিবেদিতা

কিন্তু এদিকে খবর এল মা মেরী অসুস্থ। নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন নিবেদিতা, তাই যেতে পারলেন না। কয়েকদিন পর জরুরী তার এল, মেরীর অবস্থা খুব খারাপ।

নিবেদিতা এবার স্থির থাকতে পারলেন না। মাকে যে তিনি কথা দিয়েছিলেন তাঁর শেষ সময়ে তাঁর কাছে থাকবেন! তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন।

তখন মেরী হোয়ার্ফ-ডেল-বার্লি নামক স্থানে বাস করছিলেন। নিবেদিতা গিয়ে দাঁড়ালেন মায়ের শয্যাপার্শ্বে। রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন!

মেয়েকে দেখে মায়ের মলিন মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠল। অস্ফুট কাতর কণ্ঠে বললেন—"এসেছিস? এসেছিস তুই?"

নিবেদিতা আহার-নিদ্রা ভুলে মায়ের শুশ্রূষা করতে লাগলেন। চিকিৎসারও কোন ত্রুটি করলেন না। কিন্তু দিন দিন অবস্থা খারাপ হতেই চলল।

একদিন অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠল। নিবেদিতা বুঝলেন শেষ সময় উপস্থিত।

ঘরের জানলা খুলে দিলেন। মাথার পাশে রাখলেন এক গোছা ফুল। ধূপ জ্বেলে দিলেন। মধুর গন্ধে সারা ঘর ভরে উঠল।

মায়ের পাশে বসে তাঁর কানের কাছে উচ্চারণ করতে লাগলেন—'হরি ওম্, হরি ওম্'—

দেখতে দেখতে শেষ সময় এসে গেল।

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন মেরী।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন বোন মে ও ভাই রিচমণ্ড। কিন্তু নিবেদিতা স্তব্ধ নির্বাক। তাঁর দুচোখ দিয়ে নীরবে অশ্রুবন্যা বয়ে যেতে লাগল।

শোক এবং দুঃখকে জয় করতে শিখেছেন নিবেদিতা।

মায়ের মৃত্যুর পর ইওরোপে থাকতে ভাল লাগল না নিবেদিতার। ভারতে ফেরবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা শেষ করে আচার্য বসু ইংলণ্ডে ফিরলেন। বসু-দম্পতির সঙ্গে নিবেদিতা বার্লিন হয়ে জেনেভায় এসে পৌঁছলেন ১লা জুলাই।

সেখানে এসে শুনলেন এক আশ্চর্য সংবাদ। মদনলাল ধিঙরা নামে এক পাঞ্জাবী যুবক লণ্ডনে সার কার্জন ওয়াইলীকে হত্যা করেছে। এই ব্যাপারে নাকি অনেকে সন্দেহ করছে নিবেদিতাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে তিনি বিপ্লববাদ প্রচার করেছেন—এই হত্যার মূলেও নাকি রয়েছে সেই প্ররোচনা।

নিবেদিতা স্তম্ভিত হলেন এই উদ্ভট সংবাদ শুনে।

চিন্তাভারাক্রান্ত মন নিয়েই তিনি জাহাজে উঠলেন।

১৫ই জুলাই ১৯০৯। জাহাজ বোম্বাই উপকূলে এসে ভিড়ল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। প্রকৃতির আকাশ এবং রাজনৈতিক আকাশ দুই-ই তখন থমথম করছে।

কেউ কেউ বলেন—বোম্বাইতে এসেই নিবেদিতা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। নানা কারণে তাঁর আত্মগোপন করার প্রয়োজন ছিল। ভারতে ফেরবার আগেই অনেক বন্ধু তাঁকে জানিয়েছিলেন—এখানে এলেই তাঁকে পুলিস গ্রেফতার করবে।

তাই নিবেদিতা বেশ পরিবর্তন করলেন। নিজের নাম গোপন করে নিলেন অন্য নাম—মিস মার্গট।

সোজা পথে না এসে নানা ভাবে ঘুরে কলকাতার বাগবাজার পল্লীতে এসে পৌঁছলেন। সেখানে এসেও তিনি সপ্তাহ ঘর থেকে

বেরোলেন না। তারপর আরও কিছুদিন ঐ ছদ্মবেশেই শহরের নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করলেন। নূতন ফ্যাশনের ইওরোপীয় পোশাকে কেউ তাঁকে চিনতে পারল না।

নিবেদিতার এই ছদ্মবেশ সম্বন্ধে দ্বিমত রয়েছে। তবু একথা ঠিক, বেলুড়মঠের উপর পুলিসের নজর পড়ল। সরকারের ধারণা হল বিপ্লবীরা পলাতক হয়ে ওখানে আশ্রয় নিচ্ছে। কয়েকজন বিপ্লবী ধরা পড়ল গেরুয়া পোশাকে। তাই সন্ন্যাসীরা হয়ে উঠলেন সরকারের চোখে ত্রাস।

মঠের অধ্যক্ষ নিবেদিতার আগমনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কোন বাইরের লোকের মঠে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। অধ্যক্ষ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলেন—সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই।

আঠারো

নিবেদিতা যখন কলকাতা এলেন তখন বাংলার ভিন্নরূপ।

রাজনৈতিকক্ষেত্রে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, উল্লাসকর এবং আরও অনেকে।

এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পর অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

কানাইলাল ও সত্যেন বসুর ফাঁসি হল। উপেন্দ্রনাথ এবং আরও কয়েকজনের হল দ্বীপান্তর। বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের প্রথমে ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। পরে অনেক চেষ্টার পর দণ্ডাদেশ শিথিল হল। হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নিবেদিতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একদিন দেখা হল 'সঞ্জীবনী' কার্যালয়ে।

অরবিন্দ অনেক বদলে গিয়েছেন। শিক্ষাবিদ্ ও বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন অরবিন্দের চেহারায় ফুটে উঠেছে একটি শান্ত সমাহিত যোগীর মূর্তি।

টেবিলের উপর একখানি পত্রিকা পড়ে আছে। তাতে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে 'কর্মযোগিন'।

প্রচ্ছদপটে রয়েছে রথের সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং যোদ্ধবেশে অর্জুন।

পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে নাম লেখা আছে—অরবিন্দ ঘোষ।

নিবেদিতা অবাক্ হলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, কী আশ্চর্য অরবিন্দের এই মানসিক পরিবর্তন!

কৌতূহলী হয়েই নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন—"একবছর তো জেলে ছিলেন। কি করে সময় কাটাতেন ?"

অরবিন্দ বললেন—"জেলে গীতা আর উপনিষদ পড়েছি। আর করেছি যোগের অনুশীলন।"

নিবেদিতা যেন খুশীই হলেন অরবিন্দের এই নূতন রূপ দেখে। বুঝতে পারলেন বিপ্লবী এবার নিয়েছেন নূতন পথ।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার ভিতর দিয়ে অরবিন্দ প্রচার করতেন জ্বলন্ত বিদ্রোহের বাণী। এবার তিনি 'কর্মযোগিন'-এর ভিতর দিয়ে প্রচার করবেন কর্ম ও যোগের বাণী। খাঁটী ভাবে মানুষকে গড়ে তোলাই হবে অরবিন্দের স্বপ্ন ও সাধনা।

পত্রিকার প্রচ্ছদপটের দিকে তাকালেন নিবেদিতা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উৎসাহ দিচ্ছেন যুদ্ধের জন্য। অরবিন্দও মানুষকে এমনি ভাবে কর্মে আহ্বান করবেন—অলস ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলবেন।

অরবিন্দ বললেন নিবেদিতাকে—"আপনি 'কর্মযোগিন' কাগজে লিখবেন তো ?"

নিবেদিতা বললেন—"নিশ্চয়ই লিখব।"

এদিকে নিবেদিতাও ভয়ানক কাজে ব্যস্ত। নানা কারণে স্কুলটি বন্ধ ছিল। ক্রিস্টিন অসুস্থ। স্কুলটি আবার খোলা হল। নিজেই নিলেন ভার। বিপ্লবী দেবব্রত বসুর বোন সুধীরা এলেন তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। সুধীরার উপর কিছুটা ভার দিয়ে তিনি একটু নিশ্চিন্ত হলেন।

নিবেদিতা এতদিন ধরে অনেক যত্ন ও দরদ দিয়ে যে বইটি লিখছিলেন, সেই "The Master as I saw him" লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে। এটি শুধু তাঁর রচিত গ্রন্থ নয়—এ যেন তাঁর জীবন-

বেদ। স্বামিজীর জীবনের উপর ভিত্তি করে বইটি লেখা। কাজেই এটি প্রকাশ করবার জন্য নিবেদিতা ব্যাকুল।

অনেক রাত অবধি হারিকেন জ্বালিয়ে বইয়ের প্রুফ দেখতেন। শরীর যখন অবসন্ন হয়ে পড়ত তখন রাস্তার ধারে ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন। আবার প্রুফ দেখবার জন্যই উঠতেন শেষ রাত্রে। স্বামিজীর আগামী জন্মতিথির দিন বইটি প্রকাশ করবেন এই তাঁর ইচ্ছা। তাই নিবেদিতার এত আনন্দ ও উৎসাহ।

ওদিকে দেশের ভাগ্যচক্র ঘুরছে।

১৯১০ সালের গোড়ার দিকেই ইংলণ্ড থেকে এল মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব। ভারতবাসীর ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্যই ব্রিটিশ সরকারের একটি নূতন পরিকল্পনা।

দেশের লোকের ভিতর আবার অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলার নির্বাসিত নেতারা মুক্তি পেলেন। সেদিন নিবেদিতার কী আনন্দ! বিদ্যালয়টি ফুলপাতা দিয়ে সাজালেন, প্রবেশদ্বারে বসালেন মঙ্গলঘট ও কলাগাছ। স্কুলের মেয়েদের ছুটি দিয়ে বললেন—"আজ আনন্দের দিন। যাও, তোমরা আনন্দ কর।"

এবার শুরু হল নিবেদিতার বাড়িতে অরবিন্দের ঘন ঘন যাতায়াত।

মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার দেশের জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করবার জন্য এগিয়ে আসছে। এই সর্বনাশা নীতি থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে।

অরবিন্দ আলোচনা করেন নিবেদিতার সঙ্গে। নিবেদিতা বলেন —"এর প্রতিবাদ করুন। লিখুন আপনার কাগজে।"

অরবিন্দ 'কর্মযোগিন' ছাড়াও 'ধর্ম' নামে একটি কাগজ বের করেছেন। দুটি কাগজের ভিতর দিয়েই প্রচার করেছেন অগ্নিময়ী বাণী।

নিবেদিতার উৎসাহে অরবিন্দের লেখনী আরও দ্রুত ও চঞ্চল হয়ে উঠল।

অরবিন্দের উপর পড়ল পুলিসের আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তিনি কখন কোথায় যান, কি করেন, পুলিস গোপনে গোপনে তার খবর রাখতে লাগল।

এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, সরকার অরবিন্দকে নির্বাসনে পাঠাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। তাতে ভীত হলেন না অরবিন্দ। 'ধর্ম' পত্রিকায় লিখলেন তেজোদ্দীপ্ত ভাষায়—"সরকার যাকেই নির্বাসিত করুন বা যত লোককেই নির্বাসিত করুন, কালচক্রের গতি থামবার নয়।"

তবু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করেন অরবিন্দ, নিজের কর্মপ্রবাহ যাতে ব্যাহত না হয়। তাই অনেক রাত্রে চুপি চুপি আসেন নিবেদিতার ঘরে।

তবু রেহাই নেই।

পুলিস এসে কড়া নাড়ে।

নিবেদিতা বুঝতে পারেন পুলিস এসেছে। তাই অরবিন্দকে লুকিয়ে রাখেন। দরজা খুলে বলেন—"কি চাই ?"

পুলিস বলে—"অরবিন্দ ঘোষ এসেছেন এখানে, তাঁকে চাই।"

নিবেদিতা বলেন—"না, তিনি এখানে নেই।"

পুলিস খুঁজে দেখে। অরবিন্দকে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম'—দুটি কাগজের ভিতর দিয়েই অরবিন্দ প্রচার করছেন তাঁর আদর্শ। মানুষকে আগে ধর্মে বলীয়ান্ হতে হবে, কর্মী হতে হবে, আদর্শবাদী হতে হবে। তবেই স্বদেশী আন্দোলন হবে সার্থক। সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্র এখনও দেশে তৈরী হয় নি।

নিবেদিতাও তাই মনে করেন।

কিন্তু দেশের যুবকরা তখন উগ্রপন্থী। তারা এখনই একটা সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চায়। অরবিন্দ এতে শঙ্কা বোধ করেন। এ নিয়ে গভীর আলোচনা হয় তাঁর নিবেদিতার সঙ্গে।

লর্ড মিণ্টো তখন ভারতের বড়লাট। তাঁর পত্নী লেডি মিণ্টো শুনলেন কলকাতার এক ক্ষুদ্র গলিতে এক অসামান্য ইওরোপীয় মহিলা বাস করেন। শিক্ষায় দীক্ষায়, চরিত্রে ও কর্মোদ্যমে তিনি অসাধারণ। ভারতীয় ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গ্রহণ করেছেন ভারতীয় নাম—সিস্টার নিবেদিতা।

সে কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠল লেডি মিণ্টোর মন। আত্মগোপন করে তাই একদিন একজন সঙ্গিনীকে নিয়ে গেলেন বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িতে।

সেদিনের সেই প্রথম দেখাতেই লেডি মিণ্টোর ভাল লাগল নিবেদিতাকে। তিনি নিজেই দিলেন তার বিবরণ—"সিস্টার নিবেদিতা দেশীয় পল্লীর এক অপরিসর গলির মধ্যে ক্ষুদ্র এক বাড়িতে বাস করেন। সেখানে যাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে বর্তমান গোলযোগের মধ্যে বিশেষ প্রহরী ছাড়া আমাকে শহরের ঐ অংশে যেতে দেওয়া হত না। বিদায় নেবার সময় আমাকে বড়লাট-পত্নী জেনে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর মুখ অনিন্দ্যসুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত। আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল।"

নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে লেডি মিণ্টো কালীঘাটের মন্দিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ তাঁর কাছে ভাল লাগে নি। সে কথা জানতে পেরে নিবেদিতা তাঁকে একদিন নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ যে গাছের নীচে বসে ধ্যান করতেন সে জায়গাটি দেখলেন। মন্দিরের শান্ত সুন্দর পরিবেশ তাঁর কাছে ভাল লাগল। তারপর তাঁরা জুতা খুলে প্রবেশ করলেন

শ্রীরামকৃষ্ণের শয়নকক্ষে। ঘরটির মধ্যে এক সহজ ও অনাড়ম্বর ভাব। দেওয়ালে টাঙ্গানো অনেক ছবির মধ্যে একটি ছবি ছিল—প্রভু যীশুখ্রীষ্ট জলমগ্ন পিটারকে উদ্ধার করছেন। সেই ছবি দেখে নিবেদিতার মন এক পবিত্র আবেগ ও অনুভূতিতে ভরে উঠল।

কিছুদিন পর লেডি মিণ্টো দেখে এলেন বেলুড় মঠ। অবশ্য সঙ্গে নিবেদিতা ছিলেন না। এরপর লেডি মিণ্টো পড়লেন হিন্দু ধর্ম ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতার রচনা। পড়ে মুগ্ধ হলেন।

এদিকে শহরে রাজনৈতিক আবহাওয়া দিন দিনই গরম হয়ে উঠছে।

অরবিন্দের কলকাতায় বাস করা দায় হয়ে উঠল। আবার খবর ছড়িয়ে পড়ল, সরকার অরবিন্দকে শীগ্‌গির গ্রেফতার করবেন এবং দ্বীপান্তরে পাঠাবেন।

'কর্মযোগিন'-এর কর্মসচিব রামচন্দ্র মজুমদার এলেন নিবেদিতার সঙ্গে পরামর্শ করতে। জিজ্ঞেস করলেন—"'কর্মযোগিন'-এর কি হবে? অরবিন্দই বা কি করবেন?"

নিবেদিতা বললেন—"'কর্মযোগিন'-এর ভাবনা পরে হবে। অরবিন্দকে বলো, তিনি যেন কোথাও গিয়ে কিছুদিনের জন্য লুকিয়ে থাকেন।"

এদিকে যোগীন-মার ভাগনে নিয়ে আসে অরবিন্দ সম্বন্ধে পুলিসের নানা রকম খবর। তাতে নিবেদিতার মনে আশঙ্কা জেগে উঠে। তিনি বুঝতে পারেন—অরবিন্দের কলকাতায় অবস্থান সত্যি বিপজ্জনক।

রামচন্দ্র মজুমদার আবার এলেন একদিন হন্তদন্ত হয়ে। বললেন—"কালকেই সকালে 'কর্মযোগিন'-এর অফিস খানাতল্লাশী হবে, অরবিন্দ গ্রেফতার হবেন।"

নিবেদিতা বললেন—"তাঁর ধরা দেওয়া মোটেই এখন সংগত হবে না। তিনি যেন কালকেই ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে যান।"

অরবিন্দ পরদিনই চন্দননগর চলে গেলেন। ফরাসী অধিকৃত রাজ্য চন্দননগর। যাবার সময় নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেও যেতে পারলেন না। রামচন্দ্রের মুখেই খবর পাওয়া গেল—'কর্মযোগিন'-এর সমস্ত ভার অরবিন্দ নিবেদিতার উপর দিয়ে গেছেন।

নিবেদিতা আর এক সমস্যায় পড়লেন।

সেদিন সরস্বতী পূজা। প্রতিবছর ধুমধাম করে স্কুলে সরস্বতী পূজা হয়। নিবেদিতার এক মুহূর্তও সেদিন সময় থাকে না। কিন্তু পূজার সব আয়োজন ফেলেই তিনি ছুটলেন চন্দননগরে। ফিরলেন রাত এগারোটায়।

অরবিন্দের সঙ্গে সেদিন কি পরামর্শ হল তা কেউ জানে না। তবে নিবেদিতা নিশ্চিন্ত ছিলেন না অরবিন্দ সম্বন্ধে। চন্দননগর কলকাতার অনেক কাছে। এ জায়গা অরবিন্দের পক্ষে নিরাপদ্ নয়। তাঁকে যেতে হবে দূরে—আরও দূরে।

কিন্তু দূরে যেতে হলে যে অনেক টাকার দরকার।

নিবেদিতা দুসপ্তাহ পরে আবার একদিন চন্দননগর গেলেন। বললেন অরবিন্দকে—"আপনি পণ্ডিচেরীতে চলে যান। সে জায়গা অনেক নিরাপদ্।"

নিবেদিতা অরবিন্দের হাতে তুলে দিলেন একটি টাকার তোড়া। বললেন—"এই নিন, আপনার পণ্ডিচেরী যাওয়ার খরচ। আচার্য বসুর কাছ থেকে এনেছি।"

অরবিন্দের চোখ ভরে উঠল কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে। নিবেদিতার চোখও অশ্রুসজল—এমন একটি মানুষকে তাঁর জন্মভূমি থেকে বিদায় দিচ্ছেন নিজের হাতে!

অরবিন্দ চলে গেলেন পণ্ডিচেরীতে।

নিবেদিতার একটি দায়িত্ব শেষ। কিন্তু আর একটি দায়িত্ব রয়েছে। 'কর্মযোগিন'-এর সমস্ত ভার তাঁর উপর।

নিজেই কলম ধরলেন 'কর্মযোগিন'-এর জন্য। লিখতে লাগলেন প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ। বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের যুগপৎ চিন্তাধারা যেন তার ভেতর দিয়ে প্রকাশ হতে লাগল।

নিবেদিতা লিখলেন—"আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরেই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত। আমি বিশ্বাস করি, বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষিবৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষগণের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, সেই শক্তিই আজ আমাদের বক্ষে জেগে উঠেছে। তার নাম জাতীয়তা।

"আমি বিশ্বাস করি, ভারতের বর্তমান তার অতীতের সঙ্গে দৃঢ়-সংবদ্ধ, আর তার সামনে জ্বলজ্বল করছে এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ। হে জাতীয়তা! সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে বেশে ইচ্ছা আমার কাছে এস। তোমাকে আমার করে নাও।"

নিবেদিতার উপর পুলিস এবার আরও রেগে গেল। সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে অরবিন্দ পালিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে রয়েছে নিবেদিতার হাত, এ কথা সকলেই জানে। পুলিসও জানে। তাই নিবেদিতার উপর চাপ আসতে লাগল। অরবিন্দ কোথায় আছেন পুলিস তাঁর কাছ থেকে জানতে চায়।

কিন্তু নিবেদিতা সে বিষয়ে নির্বাক্। পুলিসকে জানান—"আমি অরবিন্দের কোন খবরই রাখি না।"

কিন্তু পুলিস বিশ্বাস করে না সে কথা। অরবিন্দের 'কর্মযোগিন'

যিনি চালাচ্ছেন তিনি অরবিন্দের খবর রাখেন না একথা একেবারেই অবিশ্বাস্য। তাই চাপের উপর চাপ আসতে লাগল।

'কর্মযোগিন' চালানোও দায় হয়ে উঠল নিবেদিতার। ২রা এপ্রিল বের করলেন তার শেষ সংখ্যা। কিছুদিন আগেই তিনি খবর পেয়েছেন অরবিন্দ নিরাপদে পণ্ডিচেরী পৌঁছে গেছেন। তাই অনেকটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতেই অরবিন্দের নূতন ঠিকানা কাগজে প্রকাশ করে দিলেন।

পুলিস স্তম্ভিত। নিবেদিতারও দায়িত্ব শেষ।

এদিকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। সরকারের উদ্যত খড়্গ নিবেদিতার উপর। নিজের আদর্শ থেকে, নিজের কর্মপথ থেকে ক্রমশঃ যেন দূরে সরে যাচ্ছেন নিবেদিতা। তাঁর চলার পথ হয়ে উঠছে কণ্টকময়।

কিন্তু তাঁর জন্য যে অপেক্ষা করছে আরও অনেক বড় কাজ— অনেক মহত্তর কর্তব্য।

নিবেদিতাকে একদিন লাট-ভবনে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন লেডি মিণ্টো। নিবেদিতা গেলেন ক্রিস্টিনকে সঙ্গে নিয়ে, আর সঙ্গে নিয়ে গেলেন স্বদেশী বিস্কুট।

চায়ের আসর বেশ জমে উঠল সেদিন। বড়লাট-পত্নী প্রশংসা করলেন স্বদেশী বিস্কুটের। অনেক কথা, অনেক গল্পগুজব হল। একসময় লেডি মিণ্টো কথায় কথায় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন— "এ দেশের যুবকরা দুর্দান্ত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে।"

তাঁর স্বামী লর্ড মিণ্টো কিছুকাল আগে যাচ্ছিলেন আমেদাবাদে। যে ট্রেনে তিনি যাচ্ছিলেন, সেই ট্রেনের উপর বোমা ফেলা হয়েছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন লর্ড মিণ্টো। সেই ঘটনা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বর্ণনা করলেন বড়লাট-পত্নী।

লেডি মিণ্টো জানতেন, নিবেদিতার উপর সরকার প্রসন্ন নন। তাই তিনি অনুরোধ করলেন নিবেদিতাকে পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে। নিবেদিতার খুব বেশী আগ্রহ ছিল না, কিন্তু জগদীশচন্দ্র পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। নিবেদিতা তখন গেলেন পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে। তার ফলে সরকারী খাতায় তাঁর নামে যে কালো দাগ পড়েছিল সেই দাগের গুরুত্ব অনেক কমে গেল। জগদীশচন্দ্র যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

উনিশ

ক্রিস্টিনের উপর নিবেদিতার ভরসা ছিল অনেকখানি। কিন্তু হঠাৎ স্বদেশ থেকে এল ক্রিস্টিনের ডাক। পারিবারিক প্রয়োজনে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হবে।

চলে গেলেন ক্রিস্টিন। নিবেদিতা যেন নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন। একমাত্র ভরসা ভগিনী সুধীরা। তবু নিবেদিতাকে স্কুল পরিচালনার গুরু দায়িত্ব নিতে হল। আর নিতে হল আচার্য জগদীশচন্দ্রকে বই লেখা ও গবেষণার কাজে সাহায্য করার ভার।

পুরানো কাজ আবার নূতন করে শুরু।

জ্ঞানী ও গুণী জনের যাতায়াত নিবেদিতার বাড়িতে লেগেই আছে। দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন নিবেদিতার প্রতিবেশী। তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' বইটির ইংরেজী অনুবাদ করছিলেন। সেই সূত্রে অনেকদিন থেকেই আসছিলেন নিবেদিতার কাছে। দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে শোনাতেন। নিবেদিতা সংশোধন করে দিতেন দীনেশচন্দ্রের লেখা অনুবাদ। এভাবেই তাঁদের দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল পরম হৃদ্যতা।

দীনেশচন্দ্রের মুখে বাংলাদেশের পল্লীর ছড়া শুনে কী যে ভাল লাগত নিবেদিতার! বাংলার পল্লীর এক নূতন ছবি যেন তিনি তাতে দেখতে পেতেন।

নিবেদিতা ছিলেন শিল্পী। ভারতীয় চিত্রশিল্প সমৃদ্ধির শিখরে

উঠেও তা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক যুগে প্রচেষ্টা শুরু হল তাকে জাগিয়ে তোলার। তাতে নিবেদিতার দানও কম নয়।

নিবেদিতা বলতেন—"শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের উপরেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কিন্তু ঐ শিল্পকে জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।"

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যে শিল্পী ও শিল্পরসিকদের আসর বসত, নিবেদিতা ছিলেন তার পরম উৎসাহী। এই সময়েই যোগাযোগ ঘটেছিল তাঁর কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ হ্যাভেলের সঙ্গে। মিঃ হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা এই তিনজনের মিলন ভারতীয় চিত্রকলায় এক নবযুগ এনেছিল।

অবনীন্দ্রনাথ একদিন বললেন—"আমি ছেলেদের তুলি ধরতে ও রং দিতে শেখাতে পারি, কিন্তু কাউকে শিল্পী বা গুণী করে তুলতে পারি না।"

নিবেদিতা সে কথা শুনে হাসলেন। মনে মনে ভাবলেন—এ কাজ তো কঠিন নয়। তুলি ধরতে শেখাবার সময় ছেলেদের মনে দেশপ্রেম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই গড়ে উঠবে শিল্পী, তবেই শিল্পসৃষ্টি হবে সার্থক। নিবেদিতা নিজের স্কুলেও তাই করতেন।

নিবেদিতার অনুপ্রেরণা ছিল অবনীন্দ্রনাথের এক মূল্যবান্ পাথেয়। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও তা স্বীকার করে গেছেন। নিবেদিতার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি শিল্পীরা।

নন্দলাল বসু একবার স্বামিজীর ছবি এঁকে নিবেদিতাকে উপহার দিলেন; ছবি পেয়ে খুব খুশী হলেন নিবেদিতা। তারপর বললেন—"ছবিতে কাপড় বড় বেশী জড়িয়েছ। স্বামিজীর ছবি আঁকবে এই ভাবে—হিমালয় থেকে গঙ্গার ধারা নেমে আসছে, পাশে স্বামিজী বসে আছেন ধ্যানস্থ ভাবে।"

নন্দলাল এর পর প্রায়ই আসতেন নিবেদিতার বাড়িতে। নিবেদিতা বলতেন—"রামায়ণ ও মহাভারত থেকে বীরত্বপূর্ণ কাহিনী নিয়ে ছবি আঁকো। তা দেখে দেখে দেশের লোকের মনে উৎসাহ জাগবে, সাহস জাগবে।"

আচার্য বসুর জীবনের স্বপ্ন—'বিজ্ঞান-মন্দির'।

নিবেদিতারও তাই।

সেই বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে। নিবেদিতার মনে কত আনন্দ!

অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা নিবেদিতার, ভারতের অর্থে ভারতীয়দের দ্বারা একটি বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হোক। সেখানে ভারতীয় ছাত্ররা বিজ্ঞান-সাধনার সুযোগ লাভ করবে, তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে।

সেই ভাবী বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা নিয়ে আচার্য বসুর সঙ্গে তাঁর চলতে লাগল কত জল্পনা-কল্পনা, কত স্বপ্নের সৌধ রচনা।

কিন্তু সেই স্বপ্ন-সৌধ নিবেদিতা চোখে দেখে যেতে পারেন নি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

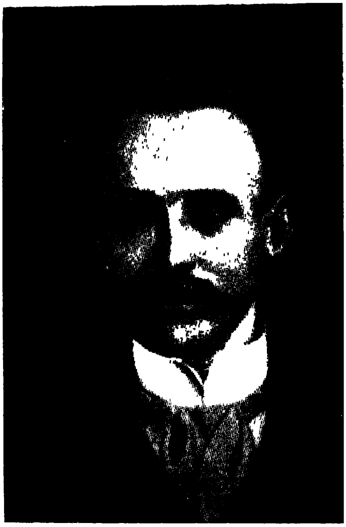
আচার্য বসুর সেজন্য মনে দুঃখের অবধি ছিল না। জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত তিনি নিবেদিতাকে ভুলতে পারেন নি।

বিজ্ঞান-মন্দির তৈরী হল। নিবেদিতাকে সেই সৃষ্টির মাঝে জগদীশচন্দ্র অমর করে রাখলেন। বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারদেশে প্রাচীরের গায়ে খোদিত হল দীপহস্তে নারীমূর্তি। সেটি নিবেদিতারই আদর্শ জীবনের প্রতিচ্ছবি।

বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধন হয় ১৯১৭ সালে। সেদিন উদ্বোধন ভাষণে আচার্য বসু বলেছিলেন—"সর্বপ্রকার সংগ্রামের উদ্যমে আমি



নিবেদিতার সহকর্মিণী
মিস ক্রিস্টিন



নিবেদিতার হিতাকাঙ্ক্ষী ও স্বামিজীর
দোভাষী মিঃ গুড্‌উইন



প্রথম স্মৃতি : নিবেদিতা মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলয়েডের সঙ্গে বেলুড়ে গঙ্গাতীরে (বর্তমান বেলুড় মঠের সংলগ্ন) এই বাড়িতে বাস করেছিলেন। স্বামিজী থাকতেন



শেষ স্মৃতি : দার্জিলিংএ নিবেদিতার চিতাভস্মে

তখন এমন কয়েকজন ছিলেন যাঁদের আমার প্রতি বিশ্বাস মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয় নি ; আজ তাঁরা পরপারে—”

নিবেদিতার কথা স্মরণ করে আচার্য বসুর চোখ সেদিন অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

জীবনের পরম বান্ধবীর স্মৃতিকে অমর করে রাখবার জন্য জগদীশচন্দ্র তাঁর উইলে এক লাখ টাকা রেখে যান। সেই টাকাতেই অবলা বসু নির্মাণ করেন বাণীমন্দির এবং তাতে ‘নিবেদিতা হল’ প্রতিষ্ঠা করেন।

নিবেদিতার প্রিয় প্রতীক-চিহ্ন ছিল ‘বজ্র’। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতের জাতীয় পতাকায় থাকবে শক্তির প্রতীকস্বরূপ বজ্র-চিহ্ন। অনেক মনীষী এবং রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে নিবেদিতা এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। অনেকেই তাঁর এই পরিকল্পনাকে করে-ছিলেন অভিনন্দিত।

কিন্তু নিবেদিতার সে আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয় নি। সে কথা জানতেন জগদীশচন্দ্র। তাই তাঁর বিজ্ঞান-মন্দিরের চূড়ায় দিয়েছেন বজ্র-চিহ্ন। সেই বজ্র প্রতীক আজও নিবেদিতার অমর স্মৃতি বহন করছে।

কুড়ি

এসে গেল ১৯১০ সাল।

নিবেদিতার জীবনে একটি কর্মক্লান্ত বছর।

গরমের ছুটিতে নিবেদিতা চললেন তীর্থ-ভ্রমণে। সঙ্গে আচার্য বসু, অবলা বসু ও তাঁদের এক ভাগিনেয় অরবিন্দ।

প্রথমে গেলেন হরিদ্বার তারপর কেদার বদরী।

দুর্গম তীর্থযাত্রায় বড় আগ্রহ নিবেদিতার। স্বামিজী তাঁকে বলেছিলেন—“নিবেদিতা, সব সময় মনে রাখবে চরৈবেতি।” তাই পাহাড় ভেঙে তীর্থপথে এগিয়ে যেতে তাঁর এত ভাল লাগে। এ যেন জীবনের সম্মুখ পথে যাত্রা।

তুষারঢাকা পর্বতমালার মাঝখানে কেদারনাথ মন্দির। অপূর্ব সৌন্দর্যে ঘেরা যেন একটি স্বপ্নপুরী! উঁচু প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সবাই এলেন মন্দিরের দরজার সামনে। সেখানে কেদারনাথের দিকে মুখ করে রয়েছে একটি গণেশমূর্তি, এক পাশে পার্বতী দেবী। নিবেদিতা তাকালেন বিগ্রহের দিকে। দেখলেন কেদারনাথ শিবলিঙ্গ নন, বা বিশেষ কোন মূর্তিও নন—বিরাট এক প্রস্তরশিলা।

কেদারতীর্থ বড় ভালো লাগল নিবেদিতার। একদিন সবাই মিলে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর গেলেন। পাহাড়ের গা বেয়ে বরফ গলে ঝরনাধারা নেমে আসছে। নিবেদিতা কিছুক্ষণ পাহাড়ের ধারে নিঃশব্দে বসে রইলেন। পাশেই বরফে ঢাকা পথ। এই পথ দিয়েই পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থান করেছিলেন।

কৌতূহলী হয়ে সকলে সেই পথ দিয়ে এগিয়ে চললেন। কিছুদূরে গিয়ে পথ মিশে গেছে পাহাড়ের অসীমতায়।

মর্ত্যলোকের শেষ পথও বুঝি এখানে। তারপর যাত্রা ঊর্ধ্বে, অনন্তলোকে।......এ সব কথা ভাবতে গিয়ে নিবেদিতার মন এক অলৌকিক অনুভূতিতে ভরে উঠল।

কেদার থেকে সকলে এলেন বদ্রীনাথ।

বদ্রীনাথ—চিরতুষার ও চিরনিস্তব্ধতার রাজ্য।

বদ্রীনাথ দর্শন করে নিবেদিতার মনে কী আনন্দ! মনে হল পৃথিবীর বাইরে এমন এক রাজ্যে তাঁরা এসে পৌঁছেছেন যেখানে কোন জাগতিক সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুভূতিই মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে না।

মুনি-ঋষিদের পীঠভূমি ভারতবর্ষের এই হল শাশ্বত রূপ।

ধন্য ভারতবর্ষ!

কলকাতা ফিরেই নিবেদিতা খবর পেলেন—'ধীরামাতা' মিসেস সারা বুল অসুস্থ। তিনি নিবেদিতাকে দেখতে চান।

এ খবর শুনে নিবেদিতার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। স্বামিজীর প্রিয় শিষ্যা 'ধীরামাতা'। স্কুল তৈরির কাজে তিনি নিবেদিতাকে কত সাহায্য করেছেন। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর সাহায্যও কম নয়। তা ছাড়া আমেরিকায় পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও তাদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি যে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেছেন তার কোন তুলনা হয় না।

নিবেদিতা আমেরিকায় চলে গেলেন। সারা বুলের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। তবু নিবেদিতাকে দেখে আঁকড়ে ধরলেন, যেন অনেক দিন পর আপন জনের দেখা পেয়েছেন।

সারার ভাই মিঃ থর্প ও কন্যা ওলিয়াকে আগেই খবর দেওয়া

হয়েছিল। তাঁরা এলেন। কিন্তু তাতে ঘটল আর এক অশান্তি।

নিবেদিতা সব সময়ে সারা বুলের কাছে থাকেন—তাঁর শুশ্রূষা করেন; সেটা হয়ে দাঁড়াল ওলিয়ার সন্দেহের কারণ। সে ভাবল, নিবেদিতা এসেছেন তার মায়ের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য।

কিন্তু মিঃ থর্প উদার। ওসব কথা ভাবেন না তিনি। বোনের অর্থের উপর কোন লোভও নেই তাঁর!

ওলিয়ার কথাবার্তা, ওলিয়ার আচরণ নিবেদিতার মনকে ব্যথায় ভরিয়ে তোলে। মনে মনে প্রার্থনা করেন—"ভগবান, আমাকে রাখো সকল লোভের ঊর্ধ্বে।"

সারা বুলকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য নিবেদিতার চেষ্টার ত্রুটি নেই—সেবাযত্নে ক্লান্তি নেই। কিন্তু সব চেষ্টা বিফল হল। নিবেদিতার কোলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আমেরিকার প্রতি আকর্ষণ নিবেদিতার যেন শেষ হয়ে গেল। তবু আরো কিছুদিন তাঁর সেখানে থাকা প্রয়োজন। সারার উইলটি না দেখা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর নিজের জন্য অর্থের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর স্কুলের জন্য ও আচার্য বসুর ল্যাবরেটরীর জন্য ধীরামাতা অর্থ দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। সে বিষয়ে কতটা কি হয়েছে জেনে যেতে হবে।

কিন্তু নিবেদিতা শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন ওলিয়া মায়ের সম্পত্তির জন্য মামলা দায়ের করেছে। এক কানা কড়িও সে নিবেদিতাকে দিতে রাজী নয়।

তখন নিবেদিতা আমেরিকায় থাকার কোন প্রয়োজন মনে করলেন না। মিঃ থর্পের উপর সব ভার দিয়ে ইংলণ্ড হয়ে ভারতের পথে যাত্রা করলেন।

ইংলণ্ডে কয়েক দিন থেকে নিবেদিতা এলেন প্যারিসে। সেখানে তখন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন 'জয়া' মিস ম্যাকলয়েড ও মিসেস লেগেট। এ যেন ত্রিবেণী সংযোগ—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন। কিন্তু সবার চোখেই জল। এতদিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী মিসেস বুল তাঁদের মায়া ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেছেন।

দুঃখে ভেঙে পড়লেন নিবেদিতা। কিন্তু 'জয়া' মিস ম্যাকলয়েড তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, উৎসাহ দিলেন। বললেন—"স্বামিজী তোমাকে যে কাজের ভার দিয়েছেন, তা তোমাকে করতেই হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না।"

মিস ম্যাকলয়েড ও মিসেস লেগেটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিবেদিতা ভারতগামী জাহাজে উঠলেন। তখন কে জানত এই তাঁর শেষ বিদায়!

১৯১১ সালের ৯ই এপ্রিল।

নিবেদিতা বোসপাড়া লেনের বাড়িতে পা দিলেন। দুদিন পরেই পুরী থেকে ফিরলেন শ্রীমা সারদাদেবী। খবর পেয়ে নিবেদিতা সেইদিনই ছুটে গেলেন উদ্বোধনের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই এখন থাকেন শ্রীমা। তাঁর থাকবার জন্যই ভক্তরা বাড়িটি তৈরি করে দিয়েছেন।

সারদাদেবীর চরণ স্পর্শ করে নিবেদিতার শোকার্ত হৃদয় যেন কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করল।

ধীরামাতার মৃত্যুর খবর শুনে কত দুঃখ করলেন শ্রীমা। তাঁর সম্বন্ধে কত কথা আলোচনা হল। যখনই নিবেদিতার মন খারাপ লাগত তখনই তিনি ছুটে যেতেন শ্রীমায়ের কাছে।

কিন্তু সারদাদেবী এবার বেশীদিন কলকাতায় রইলেন না।

একমাস পরেই জয়রামবাটিতে চলে গেলেন। তার পরই নিবেদিতা নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন।

নিবেদিতা একদিন গেলেন বেলুড় মঠে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁকে দেখে খুব খুশী হলেন। স্বামিজী যে ঘরে থাকতেন সে ঘরে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। স্বামিজীর স্মৃতি মানসপটে ভেসে উঠতেই দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। নীরব আবেদনে মুখর হয়ে উঠল অন্তর—"বলো স্বামিজী, বলো, আমি তোমার কাজের যোগ্য হতে পেরেছি কিনা, বলো"—

অশ্রুধারা এবার গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

চিন্তার অকূল সমুদ্র।

মন তাতে হাবুডুবু নিবেদিতার।

বিদ্যালয়ের জন্য টাকার দরকার। টাকার দরকার জাতীয় শিল্পকলার উন্নতির জন্য। সারা বুল অনেককাল আগে নিবেদিতাকে জানিয়েছিলেন—ভারতের বিভিন্ন সৎকাজের জন্য কয়েক হাজার পাউণ্ড তাঁর উইলে রেখে যাবেন।

নিবেদিতার প্রিয় স্বপ্ন জাতীয় শিল্পকলার নবজাগরণ। তিনি সারা বুলকে বলেছিলেন—"যখন ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার নবজাগরণ হবে, তখনই ভারতবাসীর একটি শক্তিশালী জাত হয়ে উঠবার সূচনা হবে।" তাই তাঁর ইচ্ছা, ভারতীয় শিল্পকলা প্রতি-যোগিতার জন্য এক হাজার পাউণ্ড নির্দিষ্ট থাকবে, তার সুদ থেকে প্রতিবছর ভারতীয় শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হবে। ভারতে বিজ্ঞানচর্চার জন্য থাকবে তিন হাজার পাউণ্ড, তা ব্যয় করবেন আচার্য বসু তাঁর ইচ্ছানুযায়ী। দু হাজার পাউণ্ড থাকবে নিবেদিতার বিদ্যালয়ের জন্য।

কিন্তু সব স্বপ্ন বুঝি বিফল হতে চলল। সারা বুলের কন্যা ওলিয়া তাঁকে কিছুই দিতে রাজী নয়।

নিবেদিতা আকুল ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সারা বুলের সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার ফলাফল জানবার জন্য।

কিন্তু এদিকে আর এক দুশ্চিন্তায় নিবেদিতার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

স্বামিজীর মা ভুবনেশ্বরী দেবী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিবেদিতা ছুটে গেলেন তাঁর শয্যাপার্শ্বে। আমেরিকায় ভূপেন্দ্রনাথকে তিনি কথা দিয়েছিলেন, তাঁর মাকে দেখাশোনা করবেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই হবে। তাই রোগিণীর পাশে থেকে তিনি দিনরাত শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল মৃত্যু। ভুবনেশ্বরী যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন তখনও স্থির নিশ্চল ভাবে তাঁর শিয়রে বসে ছিলেন নিবেদিতা।

শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল ভুবনেশ্বরীর শবদেহ। নিবেদিতা বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। শ্মশানে বসেই লিখলেন আমেরিকায় পলাতক ভূপেন্দ্রনাথের কাছে এক সমবেদনা-পূর্ণ পত্র।

মন উদ্বিগ্ন—চিন্তাক্লিস্ট। চারদিক যেন ঢেকে আসছে নিবিড় অন্ধকারে। চাই আশার আলোক—চাই প্রেরণা—চাই শক্তি।

এমন সময় অপ্রত্যাশিত খবর এলো আমেরিকা থেকে। ওলিয়া মামলায় হেরে গেছে। আত্মহত্যা করে জুড়িয়েছে তার মনের জ্বালা। সারা বুলের সম্পত্তির অংশ পাবেন নিবেদিতা—ভারতের সেবাতেই তা ব্যয়িত হবে।

একসঙ্গে দুটি খবর—একটি দুঃখের, একটি আনন্দের। ওলিয়াকে ভালবাসতেন নিবেদিতা। এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর খবর শুনে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা

করলেন—"ভগবান, ওলিয়ার অশান্ত মনকে এবার শান্ত কর। পরপারে গিয়ে যেন সে সুখী হয়।"

'একে একে নিবিছে দেউটি।'

এবার পালা এল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের। ২১শে অগস্ট তিনি উদ্বোধনের বাড়িতে দেহত্যাগ করলেন।

রামকৃষ্ণানন্দ—মাদ্রাজে থাকতে সেখানে কতভাবেই না নিবেদিতাকে সাহায্য করেছিলেন! তিনিই তাঁকে দিয়েছিলেন স্বামিজীর জীবনী রচনায় উৎসাহ। সেই অকৃত্রিম বন্ধু এবং স্বামিজীর গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দও চলে গেলেন।

জীবনের উপর কেমন যেন এক নিস্পৃহ ভাব এসে গেল নিবেদিতার। তাঁকেও হয়তো এবার যেতে হবে। তাই কথায় কথায় অনেকের কাছেই বলতেন—"আমি হয়তো আর বেশীদিন বাঁচবো না।"

এজন্যই বুঝি জীবনের আরব্ধ কাজগুলি শেষ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিবেদিতা। মিসেস সারা বুলের প্রতিশ্রুত অর্থ উদ্ধারের জন্য লেখালেখি করতে লাগলেন। এজন্য তাঁর উদ্বেগের সীমা রইল না।

এদিকে, কি জানি কেন, ভগিনী ক্রিস্টিনের সঙ্গে নিবেদিতার মনোমালিন্য বেধে উঠল। কয়েকমাস আগে তিনি নিজের দেশের পারিবারিক ঝামেলা মিটিয়ে ভারতে ফিরে এসেছেন। নিবেদিতা তাঁকে সমস্ত কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন। কিন্তু ক্রিস্টিনের ভাব যেন অন্যরকম।

কি যেন এক ভুল বোঝাবুঝি হল দুজনের মধ্যে। ক্রিস্টিন রাগ করে চলে গেলেন মায়াবতীতে।

কিছুকাল পরেই ভুল ভেঙে গেল ক্রিস্টিনের। খবর পেলেন নিবেদিতা দার্জিলিং-এ অসুস্থ—তাঁর জীবন সংশয়।

ক্রিস্টিন দার্জিলিং যাবার জন্য তৈরী হলেন। কিন্তু তার পরেই খবর এল, নিবেদিতা পরলোকে।

ক্রিস্টিনের আর দার্জিলিং যাওয়া হল না। নিবেদিতার সঙ্গে আর দেখা হল না তাঁর। এ দুঃখ তাঁর মন থেকে সারা জীবনেও যায় নি।

সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন ক্রিস্টিন। নিবেদিতার মৃত্যুর তিন মাস পরে শোকার্ত হৃদয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নিবেদিতার গড়া বিত্থালয়ের প্রাঙ্গণে। তুলে নিয়েছিলেন স্কুল পরিচালনার ভার।

কিন্তু নিবেদিতা তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী ক্রিস্টিনের উপর কোনদিন দোষারোপ করেননি। স্বামিজীর স্বপ্ন সফল করার কাজে ক্রিস্টিনের সাহায্য ও দুঃখবরণের কথা তিনি কখনো ভুলে যান নি। তিনি বিশ্বাস করতেন ক্রিস্টিনের উপরেই তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার দিয়ে যেতে হবে।

তাই তিনি কথায় কথায় বলতেন—"ক্রিস্টিন ফিরে আসবে—ক্রিস্টিন আবার ফিরে আসবে আমার কাছে।"

একুশ

মুহূর্তমাত্র অবসর নেই নিবেদিতার। ক্রিস্টিন চলে যাওয়ার পর বিদ্যালয়ের অনেক দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজের ঘাড়ে। তার উপর রয়েছে নিজের লেখা। তা ছাড়া আচার্য বসুর গবেষণার কাজে ও তাঁর নূতন পুস্তক রচনায় সাহায্য করতে হয়।

এত কাজ করেও নিবেদিতার মন ভরে ওঠে নীরব হাহাকারে—হায়! জীবনের কত কাজ যেন বাকী রয়ে গেল।

শরীর ভেঙে পড়ল নিবেদিতার।

ক'দিন ধরে আচার্য বসুর বাড়িতে নিবেদিতা অনুপস্থিত। তাই চিন্তিত হয়ে জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক এলেন নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে।

এসে দেখলেন নিবেদিতা বিছানায় বসে আছেন। আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন দেয়ালের তাকে রাখা একটি ছোট্ট বুদ্ধমূর্তির দিকে। এই বুদ্ধমূর্তিটি নিবেদিতার বড় প্রিয়। তিনি দীনেশচন্দ্র সেনের কাছ থেকে কিছুদিন আগে এটি চেয়ে নিয়েছিলেন। সেই থেকে ফুল ও ধূপবাতি দিয়ে ভক্তিসহকারে করেন এর নিত্য সেবা।

নিবেদিতার চেহারার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন জগদীশচন্দ্র। বললেন—"তোমার শরীর খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখছি। চলো, দার্জিলিং ঘুরে আসি।"

নিবেদিতা বললেন—"গেলে মন্দ হতো না। কিন্তু কাজ যে অনেক।"

অবলা বসু বললেন—"সে কথা শুনবো না। কাজ তো সব সময়েই করছেন। পূজার ছুটি এগিয়ে আসছে। চলুন ঘুরে আসি।"

অনেক বলার পর নিবেদিতা রাজী হলেন। স্থির হল, পূজার ছুটি হলেই তিনজন একসঙ্গে দার্জিলিং রওনা হবেন।

সেই অবস্থায় নিবেদিতা একদিন গেলেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। গিরিশচন্দ্রের বাড়ি নিবেদিতার বাড়ির কাছেই। আগেও মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ি যেতেন। গিরিশচন্দ্র অসুস্থ শুনে নিবেদিতা ভাবলেন দার্জিলিং যাওয়ার আগে একবার দেখা করে যাই। গিয়ে দেখলেন, অসুস্থ শরীর নিয়েই গিরিশচন্দ্র 'তপোবল' নাটক লেখায় ব্যস্ত রয়েছেন।

নিবেদিতা বললেন—"আমি দার্জিলিং যাচ্ছি। এসে যেন আপনাকে সুস্থ দেখতে পাই।"

সে কথা শুনে গিরিশচন্দ্র হাসলেন।

'তপোবল' নাটকের পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে নিবেদিতা বললেন —"ফিরে এসে আপনার নাটকের অভিনয় দেখব।"

কিন্তু নিবেদিতার সে আশা পূরণ হয় নি। তিনি আর ফিরে আসেন নি কলকাতায়। 'তপোবল' নাটক অভিনয় শুরু হল কিন্তু নিবেদিতা নেই। সে কথা স্মরণ করে গিরিশচন্দ্রের মনও শূন্যতার বেদনায় হাহাকার করে উঠল।

গিরিশচন্দ্র 'তপোবল' নাটক নিবেদিতার নামে উৎসর্গ করে তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রাখলেন। উৎসর্গ-পত্রে লিখলেন—

পবিত্র নিবেদিতা,

বৎসে! তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আমোদ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? দার্জিলিং যাইবার সময়, আমায় পীড়িত দেখিয়া স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে 'আসিয়া যেন তোমায় সুস্থ দেখিতে পাই।' আমি জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস না? শুনিতে পাই মৃত্যুশয্যায় আমায় স্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

দার্জিলিং রওনা হওয়ার আগে নিবেদিতা গেলেন স্বামী সারদানন্দ, গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সঙ্গে দেখা করতে উদ্বোধন বাড়িতে। যোগীন-মাকে প্রণাম করে বললেন—"যোগীন-মা, আমি বোধহয় আর ফিরব না।"

যোগীন-মা আঁতকে উঠে বললেন—"সে কি নিবেদিতা, তুমি এসব কি বলছ!"

নিবেদিতা বললেন—"কি জানি যোগীন-মা, আমার কি রকম মনে হচ্ছে, এই বোধহয় শেষ।"

তারপর নিবেদিতা গেলেন স্কুলে। সেখানে অনেক মেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। নিবেদিতা তাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন—তাই সবার মনই বেদনা-ভারাক্রান্ত। কিন্তু তারা কি জানত নিবেদিতার কাছে আর তারা পড়বার সুযোগ পাবে না! সিস্টার আর তাদের আদর করবেন না—তাদের কাছে গল্প বলবেন না!

বাগবাজারের প্রতিবেশীরাও এলেন প্রতিবারের মত তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। কিন্তু তাঁরাও কি জানতেন—এই বিদায়ই নিবেদিতার শেষ বিদায়!

দার্জিলিং-এ সকলে এসে উঠলেন 'রায় ভিলায়'। বেশ আনন্দেই কেটে গেল কয়েকটি দিন। নিবেদিতার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হল একটু।

এবার স্থির হল সবাই মিলে 'সন্দক ফু' গিরিশিখরে অভিযান করবেন। তুষারে ঢাকা গিরিশিখর 'সন্দক ফু' দার্জিলিং থেকে দু-তিন দিনের পথ। ঘোড়ায় চড়ে সবাই যাবেন সেই প্রমোদ অভিযানে।

যাত্রার জন্য সবাই তৈরী, হঠাৎ নিবেদিতার হল জ্বর।

জগদীশচন্দ্র ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকারকে প্রথমে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন জ্বরটা একটু খারাপ ধরনের। তখন জগদীশচন্দ্র ডাক্তার নীলরতন সরকারকে আসবার জন্য কলকাতায় টেলিগ্রাম করে দিলেন। টেলিগ্রাম পেয়ে ডাক্তার সরকার ছুটে গেলেন দার্জিলিং-এ।

নিবেদিতাকে পরীক্ষা করে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বললেন—"কঠিন রোগ। রক্ত আমাশা!"

সে কথা শুনে বসু-দম্পতি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। পাহাড়ী অঞ্চলে এ ব্যাধি যে মারাত্মক। অথচ রোগীকে এখন কলকাতায় নিয়ে যাওয়ারও কোন উপায় নেই।

কিন্তু নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন—তিনি আর বাঁচবেন না। তাই অনেককেই দেখতে চাইলেন। অবলা বসু বললেন—"আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?"

নিবেদিতা বললেন—"এবার আমার যাবার পালা। স্বামিজী বলে গেছেন, আমি চুয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যেই মরব। শুয়ে শুয়ে হিসাব করছিলাম, আর কদিন বাদেই তো চুয়াল্লিশে পড়ব আমি।"

সে কথা শুনে চমকে উঠলেন অবলা বসু। বললেন—"ওকথা ভুলে যান। কী এমন বয়স আপনার? এখনো কত কাজ আপনাকে করতে হবে।"

ম্লান হাসি হেসে নিবেদিতা বললেন—"স্বামিজী মারা গেলেন উনচল্লিশে।—একটা গল্প বলি শোন। ঘটনাটি ঘটেছিল স্বামিজী মারা যাবার কিছুদিন আগে। একদিন বেলুড় মঠে এক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করবার জন্য আমার ডাক পড়লো। সেদিন মিস ম্যাকলয়েডকে স্বামিজী বললেন, 'আমি কখনো চল্লিশে পৌঁছব না।' মিস ম্যাকলয়েড বললেন, 'কিন্তু স্বামিজী, বুদ্ধদেব চল্লিশ থেকে আশি বছরের আগে তো তাঁর জীবনের বড় কাজ করেন নি।' স্বামিজী বললেন, 'আমার যা বাণী তা আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন আমাকে যেতেই হবে। কেন জান? বড় গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বড় হতে দেবে না। ছোটদের জন্য স্থান করে দেবার জন্য আমাকে যেতেই হবে।' স্বামিজীর সেই কথাই আজ আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে।"

অবলা বসুর মনটাও বুঝি ব্যথায় মুষড়ে উঠল। বললেন—"থাক ওসব কথা।"

দিনরাত নিবেদিতার শিয়রে বসে থাকেন অবলা বসু।

নিবেদিতা বললেন—"ইস, আমার জন্য তোমাদের খাটুনির শেষ নেই।"

অবলা বসু বলেন—"বিদেশে যখন অসুস্থ হয়েছি তখন আপনি আমাদের জন্য যথেষ্ট করেছেন, এবার আমাদের পালা।"

সত্যি এবার পালা অবলা বসুর ও জগদীশচন্দ্রের। তাঁদের চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি রইল না। বিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকারও চিকিৎসা করলেন প্রাণপণ। নিবেদিতাকে তিনি ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন।

তবু চোরের মত চুপি চুপি মৃত্যু এগিয়ে আসতে লাগল নিবেদিতাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য। নিবেদিতা যেন সেই নিঃশব্দ পদধ্বনি শুনতে পেলেন।

তবু ধীর অচঞ্চল নিবেদিতা। তাঁর বুঝি স্মরণপথে ভেসে এল স্বামিজীর বাণী। মহাপ্রয়াণের আগে স্বামিজী একদিন তাঁকে বলেছিলেন—"যখন মৃত্যুসময় এগিয়ে আসবে তখন সব দুর্বলতা চলে যাবে। বাইরের কোন চিন্তা, ভয় বা উদ্বেগ তখন থাকবে না।"

তাই বুঝি মনের গভীরে নিস্তব্ধভাবে ডুবে আছেন নিবেদিতা। জীবনেও যেমন, মরণেও তেমন তিনি আজ নির্ভীক।

৭ই অক্টোবর। নিবেদিতা বুঝলেন বিদায় নেবার লগ্ন এগিয়ে আসছে। কিন্তু এখনও একটি কাজ রয়েছে বাকী। উইল করে যেতে হবে। তাই জগদীশচন্দ্রকে সাক্ষী রেখে তৈরি করলেন উইল। তাতে লেখা হল ঃ

'বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার যে তিনশত পাউণ্ড আন্দাজ জমা আছে, পরলোকগতা মিসেস সারা বুলের সম্পত্তির মধ্যে আমি যে সাতশত পাউণ্ড পাইব এবং আমার যাবতীয় পুস্তক হইতে যাহা আয় হইবে এই সবকিছু আমি বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের হাতে অর্পণ করিলাম। তাঁহারা ঐ অর্থ চিরস্থায়ী ফাণ্ডরূপে জমা রাখিবেন এবং ভারতীয় নারীদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্য ভগিনী ক্রিস্টিনের পরামর্শ মত উহার আয় হইতে অর্থ ব্যয় করিবেন।'

বিরাট একটি কর্তব্য শেষ করে নিবেদিতার চোখ মুখ যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর জীবনের সব কিছু সঞ্চয় এবং নিজের দেহটুকু পর্যন্ত ভারতের মৃত্তিকায় মিশিয়ে দিতে পারলেই তিনি মুক্ত— তিনি ধন্য।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে আসছে মৃত্যু।

সে কি অন্ধকার! না আলো!

রায় ভিলার পাইন গাছের মাথায় ঝিকমিক করছে প্রভাত সূর্যের রক্তিম আভা।

১৩ই অক্টোবর।

নিবেদিতার অন্তর থেকে বেরিয়ে এল আকুল প্রার্থনা ঃ

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি।

'অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া চল, অজ্ঞানের অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও; স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম আমার নিকট জ্যোতির্ময়রূপে আবির্ভূত হও।'

অবলা বসু বিনিদ্র নয়নে বসে আছেন নিবেদিতার শয্যাপার্শ্বে। কখন ভোর হয়েছে তাও হয়তো তিনি জানেন না।

হঠাৎ নিবেদিতার চোখে মুখে ফুটে উঠল এক দিব্যজ্যোতি। অবলা বসু বিস্ময়ে তাকালেন আভরণহীনা চিরতপস্বিনীর অপরূপ মূর্তির দিকে।

অস্ফুট মৃদু-মধুর কণ্ঠে নিবেদিতা বলে উঠলেন—"The boat is sinking. But I shall see the sunrise.—তরণী ডুবছে, কিন্তু আমি সূর্যোদয় দেখব।"

ঘরের সমস্ত জানালা খুলে দেওয়া হল।

তুষারশিখরে তখন নূতন সূর্যোদয়ের মহিমা! নিবেদিতা তাঁর প্রাণের শেষ অর্ঘ্য রেখে গেলেন দেবতাত্মা হিমালয়ের বুকে।

সমাপ্ত